ফুলদানি ক্লাব

বিমল কর

কে যে আমাদের ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'ফুলদানি ক্লাব'—আজ আর তা মনে পড়ে না। বুলুদা বা নরেশকাকার মধ্যে কেউ একজন হতে পারে। ভেবেচিন্তে দিয়েছিল, না, ঠাট্টা করে, তাও বলা মুশকিল। তবে নামটা আমাদের পছন্দ হয়েছিল।

আট-দশটা ছেলে আমরা, বয়েসে কেউ বারো-তেরো, কেউ-বা পনেরো, একই পাড়ার এদিক-ওদিকে থাকি, পড়ি একই স্কুলে 'মধুগঞ্জ অ্যাকাডেমি'-তে, কেউ সেভেন-এইট ক্লাসে, কেউ-বা নাইন ধরেছি ; চেহারার ধরনও এক-একজনের এক-একরকম। তা তো হবেই। হাতের পাঁচটা আঙুলই একরকম হয় না, তো মানুষ। অন্তু ছিল রোগা লম্বা, ঘনশ্যাম ছিল নাদুসনুদুস, ইন্দু ছিল বেঁটে কাঠি-কাঠি চেহারার ছেলে। একেবারে ছুঁচোবাজি ধরনের স্বভাব তার। মোটা, গোল্লা, ছিপছিপে চেহারা, তাও ছিল। আবার স্বভাবের দিক থেকে কেউ ছিল অনেকটা শান্ত, কেউ দুরন্ত, কারও মাথায় নানান ফন্দি ঘুরে বেড়াত, কেউ-বা গোবেচারি নিরীহ ধরনের। বোধ হয় এইসব দেখেশুনেই 'ফুলদানি ক্লাব' নামটা আমাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফুলদানিতে পাঁচরকম ফুল না থাকলে মানাবে কেন?

ফুলদানি ক্লাবের গল্প বলতে হলে আগে আমাদের মধুগঞ্জ শহরটার কথা বলতে হয়। অবশ্য মধুগঞ্জকে ঠিক শহর বলা যায় না। মফস্বলের টাউন বলা যায়। লোকে 'টাউন'ই বলত। জায়গাটার চেহারা পাহাড়তলির মতন। অজস্র গাছপালা, উঁচুনিচু প্রান্তর, নুড়ি পাথরের মাঠ ঝোপঝাপ, কাঁটালতায় ভর্তি। রেল স্টেশন মাইল

দেড়েক তফাতে। সেটা অবশ্য কোনও কথাই নয় ; মফস্বল শহরে দেড়-দু'মাইল কিছুই নয়। শহরের পুবদিকে রেল স্টেশন। একেবারে ছোট নয়। ঝকঝকে চকচকে চেহারা। গেরুয়া রঙের মোরাম-বিছানো প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে করবী আর কলকে ফুলের গাছ গোটা চার-পাঁচ।

স্টেশনের বাইরে রেলের বুকিং অফিস, মালগুদোম, একচিলতে মুসাফিরখানা। খানিকটা তফাতে রেলের এক দপ্তর। কয়েকটা টাঙা স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, ওরই কাছাকাছি বিরজু হালুইকরের পুরি কচুরি জিলাবি ভাজার দোকান। পাশেই চাঅলা গণেশ মাটির খুরি আর বেজায় বড় এক কেটলি উনুনে চাপিয়ে বসে থাকত।

আমাদের পাড়া ছিল পশ্চিম দিকে। বাজার ছাড়িয়ে। একজোড়া শিমুলগাছ বাড়তে বাড়তে মাথায় চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান হয়ে গিয়েছে যেখানে, তারপরই আমাদের পাড়া। নামটাও হয়েছিল শিমুলপাড়া।

স্কুল একেবারে উত্তরে।

মস্ত কম্পাউন্ড, গোটা দুয়েক বিশাল ঘোড়ানিমের গাছ আর কাঁঠালগাছ একটা, তিন দিকে টালির চাল দেওয়া ব্যারাকবাড়ির মতন লম্বাটে ঘরে আমাদের স্কুল। পাকা বাড়ি মাত্র একটা। সেখানে হেডমাস্টারমশাইয়ের অফিস, মাস্টারমশাইদের বসার ব্যবস্থা, আর মাত্র দুটি মাঝারি ঘরে উঁচু ক্লাসের ক্লাসরুম।

আমাদের চোখে সবই ভাল লাগত। গরমকালে মর্নিং স্কুল—কষ্ট হত না, বর্ষাকালে যতই মেঘ ডাকুক, ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামুক—আমরা ছুটির পর বইখাতা, জুতো হাতে করে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরতাম। আর শীতকালে মনে হত, আকাশের সব রোদ আমাদের স্কুলের গা তাতিয়ে রেখেছে।

এবার তবে ক্লাবের কথায় ফিরে আসি।

একই পাড়ার আট-দশটা সমবয়েসি ছেলে একই সঙ্গে ঘুরবে ফিরবে, খেলাধুলো করবে, মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি—এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তা না হলে ক্লাব কেন?

মধুগঞ্জে দুটো ক্লাব ছিল। বরাবরই। দুটোই বড়দের। একটা 'বেঙ্গলি ক্লাব'। সেখানে জেঠা বাবা কাকাদের আসা-যাওয়া, তাস পাশার আড্ডা, লাইব্রেরির বই ঘাঁটা। অন্য একটা ক্লাব ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের। নাম 'গ্রেগারিস ক্লাব'। কে যে গ্রেগারি, জানি না। শুনেছি গ্রেগারি বলে এক সাহেব নিজেদের জাতভাইদের জন্যে একটা দোকান বা 'স্টোর্স' খুলেছিল আদ্যিকালে। সেই স্টোর্সই পরে হয়ে যায় ক্লাব। এই দুটো বাদে শশধরদা বানোয়ারিদাদের একটা ফুটবল ক্লাব ছিল, অবশ্য তার নাম 'ইয়াং স্পোর্টিং'।

হঠাৎ একদিন শুনি জোড়া ফটকের দিকে যে পুরনো বাবুপাড়া, সেখানকার ছেলেরা একটা ক্লাব খুলেছে। নাম দিয়েছে 'হিলসাইড ক্লাব'। শুনে আমাদের আর চোখের পাতা পড়ে না। জোড়া ফটকের কাছে কোনও 'হিল' নেই, মানে পাহাড়। মাইলটাক দূরে একটা বালিয়াড়ি ধরনের ঢিবি আছে, আগে বলত চাঁদমারি, সেটা কিছুতেই পাহাড় নয়। মামুলি দু'-পাঁচটা গাছ, ঝোপঝাড় ছাড়া পুরো জায়গাটা মাঠ। কাঁকরে ভরতি, ভাল করে ঘাসও জন্মায় না। সেই নেড়া মেঠো জমি হয়ে গেল 'হিল সাইড...'। বা রে! পিন্টু বলল, "গোরু চরোয়িং মাঠ কবে হিল হয় রে!" বলে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। পিন্টু নিজের কায়দায় প্রায়ই এরকম ইংরিজি বলে।

তা সে যাই হোক, ক্লাব হওয়ার পর ওরা—মানে হিল সাইডরা আমাদের খুব খাতির করে ওদের মাঠে ফুটবল খেলতে ডাকল। বলল, লেমোনেড আর বরফ খাওয়াবে।... আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

তারপর যা হল, আমরা লজ্জায় মুখ তুলতে পারি না। ছ' গোলে হেরে ভূত। হয়েছিল সাত গোল, একটা আমরা শোধ করতে পারলাম ওদের দয়ায়। ছয়ের দল নিয়ে খেলা, কাজেই আমরা ছ'জন একটা করে গোল গলায় ঝুলিয়ে পাড়ায় ফিরলাম।

এর পর অন্তু বলল, "আমাদের একটা ক্লাব করতে হবে। ক্লাব না করলে মান-সম্মান নিয়ে কেউ মাথা তুলতে পারে না। একাট্টা হওয়া চাই। ডিসিপ্লিন দরকার। ক্লাব হল একটা বডি—মানে শরীরের মতন, আমরা হব তার হাত পা মাথা চোখ—মানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ... !"

পিন্টু বলল, "শিং— ?"

"কীসের শিং?"

"তা না হলে গুঁতোব কেমন করে?"

"গাধা! আমরা গোরু মোষ না ছাগল যে, শিং থাকবে! বাজে কথা একদম বলবি না!"

পিন্টু একটু হেসে চুপ করে গেল।

দিন পনেরোর মধ্যে আমাদের ক্লাব হয়ে গেল। কানুদের বাড়ি বেশ বড়। দোমহলা। নীচের তলায় রাস্তার দিকে একটা ছোট ঘর পাওয়া গেল সহজেই। জঞ্জাল সাফসুফ করে আমরা বসে পড়লাম ঘরে। ভাঙা বেঞ্চি, মাদুর, পুরনো ক্যারাম বোর্ড, লুডো, তাপ্পিমারা ফুটবল, একজোড়া হকি স্টিক নিয়ে আমাদের ক্লাবের শুভযাত্রা শুরু হল।

বুলুদা নিজেই যেচে এসে বলল, "তোরা একটা খাতা তৈরি করে নে। তাতে মেম্বারদের নাম লিখে নিবি। তারপর লিখবি ক্লাবের উদ্দেশ্য। শুধু খেলা দিয়ে ক্লাব হয় না ; পাড়ার পাঁচজনের ভালমন্দও দেখতে হয়। তোরা কী কী সোশ্যাল ওয়ার্ক করবি—তাও লিখে ফেলিস। যেমন ধর লিখলি—কাহারও বাড়িতে ইঁদুর বেড়াল পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইলে আমরা তাহা পরিষ্কার করিব। কোনও প্রতিবেশীর

গোরু ছাগল হারাইলে গোশালায় গিয়া ছাড়াইয়া আনিব। থালাবাটি চুরি হইলে চোর ধরিয়া দিব... ইত্যাদি, ইত্যাদি...”

বুলুদার ঠাট্টা আমরা গায়ে মাখলাম না।

ক্লাব নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে উঠলাম। মাস দুই তিন বেশ কাটল। তারপরই এক কাণ্ড হল।

বুলুদা হঠাৎ এসে বলল, “ওরে সর্বনাশ হয়েছে। শুনেছিস?”

“কী সর্বনাশ?”

“এই শহরে স্বয়ং মহাদেব হাজির হয়েছেন।”

“কে মহাদেব?”

“মহাদেব জানিস না! মুখ্যু কোথাকার। শিবশম্ভু। হিমালয় থেকে আবির্ভাব। সঙ্গে দুই চেলা, লণ্ড আর ভণ্ড। ডেন্‌জেরাস!”

আমরা অবাক হয়ে বুলুদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে বুলুদা বলল, “তোরা একেবারে দানাপুরি ছাগল। কিস্যু জানিস না। নিজেদের ঠাকুর দেবতাকেও চিনিস না।”

কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হল। চিনি না মানে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, মায় শেতলা ঠাকুর পর্যন্ত চিনি, আর বুলুদা বলল কিনা কিছুই চিনি না। তবে আরও কত ছোট-বড় ঠাকুর আছে চিনব কেমন করে!

অন্তু বলল, “তা হঠাৎ কৈলাস থেকে বাবা ভোলানাথ মধুগঞ্জে

চলে এল কেন?"

বুলুদা নস্যি নেয়। এক টিপ নস্যি টেনে নাক মুছতে মুছতে বলল, "শোন, তোরা তো পুরাণটুরান জানিস না। চোখেও দেখিসনি। আমার দাদুর বাড়িতে আমি দেখেছি। আঠারোটা পুরাণ আমাদের। তার ওপর গণ্ডা গণ্ডা উপপুরাণ। তা বাদেও কত যে ফালতু আছে কে জানে! অত জেনে তোদের লাভ কী! সোজা কথা সিম্‌পিল্‌ ভাবে জেনে নে।"

"বলো।"

"পিতামহ ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করছেন—তখন কী ছিল অবস্থা? মাটি নেই, গাছপালা নেই, পাহাড় পর্বত নেই, পশুপাখি নেই ; জল, শুধু জল আর জল। চারদিকে জল—ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার ..."

"নট এ ড্রপ অব ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক ...," ইন্দু ফোড়ন কাটল।

"পাকামি করিস না," বুলুদা ধমক দিল। "যা বলছি শোন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার কথা ভাবছেন, আর এক খাবলা করে মাটি ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছেন জলের মধ্যে। তাই দেখে বিষ্ণু বললেন, বড়দা, এটা তুমি কী করছ?"

"বড়দা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়দা। ... বিষ্ণুর কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, 'হ্যাঁ হে বিষ্টু, কেন ফেলছি জানো? ওই খাবলা মাটিগুলোই শেষে ডাঙা হয়ে যাবে—মানে স্থল। তারপর হবে গাছপালা। পশু-পাখিদের পালা তারপর।' বলতে বলতে ব্রহ্মা অন্যমনস্ক ভাবে মস্ত একটা মাটি আর পাথরের চাঙড় তুলে ছুড়ে দিলেন জলে। শব্দ হল। মহাদেব বললেন, 'ওটা কী হল দাদা?' ... ব্রহ্মা মুচকি হেসে বললেন, 'ওটাই একদিন হবে হিমালয় পাহাড়। পর্বত। বিশাল বিশাল গাছ, জঙ্গল, পাথর, গুহা, মেঘ, জন্তু-জানোয়ার, নদী, ঝরনায় সে এক দেখার

থাকার মতন যোগ্য লোক।'"

"আমি?"

"'তোমার নাম হবে কৈলাসপতি, কৈলাসেশ্বর, শঙ্কর, মহাদেব, মহেশ্বর, নীলকণ্ঠ ... আরও কত কী!' দু'জনে কথা হচ্ছে দেখে বিষ্ণু লুকিয়ে লুকিয়ে কেটে পড়লেন। কী জানি, মহাদেব রাজি না হলে যদি তাঁকে ওই জায়গায় পোস্টিং করে দেন বড়দা, সে বড় বিদঘুটে কাণ্ড হবে। বিষ্ণু ফ্যান্সি টাইপের দেবতা, পাহাড় জঙ্গল নিরিবিলি তাঁকে মানায় না।"

আমি হেসে বললাম, "সোজা কথা, মহেশ্বর মহাদেব কৈলাসপতি রাজি হয়ে গেলেন।"

"হলেন। তবে খুঁতখুঁত করে বললেন, 'আমি একলা ওখানে থাকব কেমন করে?'"

"'একলা কেন থাকবে,' ব্রহ্মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে বউমা পার্বতী থাকবেন। তা ছাড়া তোমার জন্যে দুটো ষাঁড় বরাদ্দ করেছি। বৃষভ। তারা তোমায় নিয়ে ঘুরবে।'"

অন্তু বলল, "আর নন্দী ভৃঙ্গী?"

"আরে ওই দুটোই তো আস্ত ষাঁড়। কখনও ষাঁড়, কখনও ভাঁড়। কথায় বলে মহাদেবের চেলা। তবে হ্যাঁ, কৈলাসপতির একটা বাহন-ষাঁড়ও আছে।"

কানু সব শুনে এবার বলল, "বুলুদা, ইয়ে—ওই মহেশ না মহেশ্বর আমাদের এখানে কোথায় এসেছেন?"

"ইমলি তালাও। ইমলি তালাওয়ের কাছে চলে যা, দেখতে পাবি। দেরি করিস না। কালই চলে যা।"

বুলুদা আমাদের যেন চাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমাদের ক্যারম খেলা বন্ধ হয়ে গেল। কানু বলল, "চল,

কালকেই যাই। কাল শনিবার। বিকেলেই যাব।”

ইমলি তালাও আমাদের শহরের পশ্চিম দিকে। এক প্রান্তে বলা যায়। বিরাট এক পুকুর, দিঘি বললেও চলে। পুকুরের আশেপাশে বড় বড় কয়েকটা তেঁতুলগাছ। অন্য গাছও আছে : বট অশ্বত্থ। ঝোপঝাড়ও চোখে পড়বে। তবে তেঁতুলগাছগুলোর জন্যেই নাম হয়েছে, ইমলি তালাও। এই পুকুরের জল পরিষ্কার। গোরু-মোষ এখানে জল খেতে আসে না, কেননা এত দূরে কে আর গোরু চরাতে আসবে! ধোবিরাও এখানে কাপড় কাচতে আসে না। লোকে এদিকে বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। বর্ষাকালে পুকুর ডুবে মাঠে জল ছড়িয়ে পড়লে দেখতেও আসে। আর আসে শীতকালে, যখন ইমলি তালাওয়ের কাছাকাছি মাঠে মেলা বসে—‘মাঘাইয়া মেলা’। একটা ভাঙাচোরা শিবমন্দিরও আছে এখানে। কতকালের মন্দির, কেউ জানে না।

আমাদের পাড়া থেকে মাইল দেড়েক দূর ইমলি তালাও।

ফুলদানি ক্লাবের ছেলেদের দু'জনের শুধু সাইকেল আছে। কানু আর বিরজুর। দুটো সাইকেলে সাত-আটজনে কেমন করে যাব! তার চেয়ে হাঁটাই ভাল। দল মিলে হাঁটলে বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট, কি আধঘণ্টা।

আমরা বিকেলের গোড়ায় বেরিয়ে পড়লাম দল বেঁধে।

তখন বর্ষা ফুরিয়েছে। শরৎকাল চলছিল। আকাশ পরিষ্কার। দুপুরের নীল হালকা হয়ে আসছে। সাদা সাদা টুকরো মেঘ ভাসছিল আকাশে। মাঠেঘাটে দেদার কাঁটাঝোপ আর কাঁটাফুল সাদা সাদা, অজস্র ফড়িং, বুনো ঘাসে সব সবুজ। গাছগুলোর মাথাও পাতায় পাতায় ভরা।

গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ অন্তু বলল, "ওই দেখ, এসে গিয়েছি।"

তাকিয়ে দেখি ইমলি তালাওয়ের বিরাট তেঁতুলগাছগুলো দেখা যাচ্ছে।

"নে, পা চালা। আর পাঁচ-সাত মিনিট," কানু বলল।

পুকুরটার সামনে গিয়ে দেখি, ভাঙা শিবমন্দিরের গায়ে গায়ে একটা খড়ের ছাউনি। মানে কুঁড়েঘর। সামনের মাঠ পরিষ্কার। কারা যেন ঘাস ঝোপ কেটে ছেঁটে তকতকে করে রেখেছে। একপাশে কিছু শুকনো কাঠ ডাঁই করা। বাঁশের মাথায় একটা লাল কাপড়ের টুকরো বেঁধে বেলগাছের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

এমন সময় দেখি একটা লম্বা মতন লোক, পাশের ইঁদারা থেকে জল তুলে বালতি হাতে এগিয়ে আসছে।

মন্দিরের কাছাকাছি ছোট ইঁদারা আছে, আমরা জানতাম না।

লোকটা দেখতে লম্বা। মাথায় রুক্ষ চুল। গায়ে জামাটামা নেই। পরনে একটা খাটো গেরুয়া কাপড়। গামছার মতন কোমরে জড়ানো। আর তার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা চিমটে ঝুলছে। এত বড় চিমটে হয় নাকি?

লোকটা আমাদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমরা থতমত খেয়ে গিয়েছি! এই কি মহেশ বা মহেশ্বর?

বিরজুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। হঠাৎ হাত জোড় করে বলল, "গোড় লাগি বাবা!"

লোকটা বালতি নামিয়ে রাখল। "খুশ রাহো!" তারপর বাংলায় বলল, হিন্দি-মেশানো বাংলায়, "তোম লোগ কাঁহা সে আসছ, বাচ্চা?"

"এই শহরের ছেলে বাবা আমরা।"

"আচ্ছা!"

"বাবা, আপনি কি সাধু মহারাজ! মহেশ—মহেশ্বর?"

লোকটা তাড়াতাড়ি দু' হাত তুলে কান চাপা দিল। "আরে ছি ছি, আমি চিমটাবাবা!"

"চিমটাবাবা!"

নিজের কোমরের ঝোলানো চিমটেটা দেখাল সে। "হ্যাঁ, আমি চিমটা। গুরুজির সাথে থাকি।"

"গুরুজি কোথায় বাবা?"

চিমটা হঠাৎ ডাক ছাড়ল। "এ লোটা, লোটুয়া, কাঁহা রে তু?"

মন্দিরের ওপাশ থেকে একটা বেঁটে মোটা লোক বেরিয়ে এল। তার মাথার চুল মহিষাসুরের মতন, চোখ লাল, গালে দাড়ি, পরনে সেই গামছা সাইজের গেরুয়া কাপড়। এর কোমরে একটা দড়ি বাঁধা। তার সঙ্গে বেশ বড় মাপের এক ঘটি—বা লোটা।

লোকটা কাছে আসতেই চিমটেবাবা আমাদের বলল, "এ হল লোটাবাবা। হামরা গুরুজির সেবা করি।" বলে লোটাকে জিজ্ঞেস করল, "এ লোটা, গুরুজি কোথায়?"

লোটাবাবা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখল যেন। "কী কাম?"

"ভেট করবে। বালবাচ্চা সব ..."

লোটা বলল, "গুরুজি তালাওমে।"

ইন্দু ফিসফিস করে আমাদের বলল, "এই চেলা দুটোই কি লণ্ড আর ভণ্ড!"

"চুপ কর, শুনতে পাবে।"

"বাংলা বোঝে?"

"বেশ বোঝে। বাংলা বলতেও পারে। হিন্দি বুলি আওড়াচ্ছে।"

"লোটার পেট দেখেছিস! তিন তাক ভুঁড়ি!"

হঠাৎ লোটা বলল, "এই কী বলছিস রে! গালি দিচ্ছিস? আমি সব বুঝি!"

কানু আর বিরজু হাত জোড় করে বলল, "না বাবা, আপনাকে গালি দিলে আমাদের জিভ খসে যাবে।"

"তবে চুপ সে বসে যা।"

ইন্দু আমার দিকে আড়চোখে তাকাল। মানে বোঝাতে চাইল, লোটা-টা বেশ ত্যাঁদড়। ওকে ছাড়লে চলবে না, সুযোগ পেলেই টাইট মারতে হবে।

আমরা বসলাম না।

আশেপাশে পায়চারি করছিলাম। কথা বলছিলাম নিচু গলায়। এমন সময় গলা শোনা গেল।

তাকিয়ে দেখি, মহেশবাবা। মনে হল, পুকুরে সন্ধেবেলার স্নান সেরে এক হাতে ভিজে বস্ত্র নিয়ে আসছেন তিনি। অন্য হাতে কমণ্ডলু। পায়ে খড়ম। বাবার গায়ের গেরুয়া বস্ত্রটি হাঁটু থেকে গলা পর্যন্ত আড়াআড়ি করে পরা। ঘাড়ের পেছন দিকে খুঁটের গিঁট। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে লোহার তাগা।

আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাথায় জটা নেই, তবে লম্বা চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। মুখে দাড়ি। চেহারাটি দোহারা। তামাটে রং গায়ের। খানিকটা স্তোত্রপাঠের মতন করে বাবা 'ওঁ শিবঃ শিবায় ...' গাইতে গাইতে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

লোটা লোকটা ছুটে গিয়ে বাবার হাত থেকে ভিজে বস্ত্রগুলো নিয়ে নিল।

আর চিমটে একটা ঘটি করে বালতির জল এনে বাবার পায়ে ঢেলে দিল।

লোটাই একটা গামছা এনে দিল বাবাকে।

পা মুছতে মুছতে বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী রে, আমায় দেখতে এসেছিস?"

আমরা চুপ। কী বলব!

"কী দেখবি! আমি সাধু মহারাজ। সাধন ভজন করি। এক-দু' সালের বেশি কোথাও থাকি না। শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজ, নিজ মন মুকুর সুধারি ...। তুলসী মহারাজ জানিস বেটা ... নামভি জানিস না! ... তো ঠিক আছে। আজ ঘর চলে যা, দুসরা দিন চলে আসিস। এ লোটা, বালবাচ্চাদের পেরসাদ দে।"

লোটা ঘরের ভেতর গেল প্রসাদ আনতে।

তার আগেই মহেশ মহারাজ হাত ঘুরিয়ে কোথা থেকে এক মুঠো বাতাসা জোগাড় করে ফেললেন। "লে রে, আয়, নাগিচ্ আয়—।"

আমাদের হাতে একটা করে গুড়ের বাতাসা দিয়ে মহারাজ হাসলেন।

আমরা অবাক!

"খেয়ে লে, পূজার পেরসাদি বেটা। ওঁ শিবঃ শিবায় ..."

আমরা বাতাসা মুখে দিলাম। ভয়ে ভয়ে।

পরের দু-তিনটে দিন আমাদের পড়াশোনা, খেলাধুলো একরকম বন্ধ। মাথার মধ্যে বাতাসা ঘুরছে, বন্ধুরা একসঙ্গে হলেই ওই একটাই কথা।

মাথার ওপর হাত তুললেন মহেশবাবা আর হাওয়ার মধ্যে থেকে এক মুঠো বাতাসা ধরে ফেললেন খপ করে! কেমন করে এটা হয়? এ কি আমড়াগাছের নিচু ঝুলন্ত ডাল থেকে ক'টা আমড়া পেড়ে নেওয়া? না, মাঠের মধ্যে ছুটতে ছুটতে দু'হাত বাড়িয়ে বর্ষাকালের উড়ন্ত ফড়িং ধরা? খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার! মহেশবাবার হুকুমে ওই

বেঁটেবাঁটকুলে লোকটা আমাদের যে প্রসাদ এনে দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ভেজানো ছোলা আর শসার কুচি। হাত পেতে সেই প্রসাদ আমরা নিয়েছিলাম। একটুও অবাক হইনি। এমন প্রসাদ তো আমরা হরদম নিয়ে থাকি, ভেজানো ছোলা, মুগ, এক টুকরো আখের কুচি, এক কোয়া বাতাবি লেবু, বড়জোর একটা খেজুর।

সাদামাঠা পুজোর প্রসাদে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ওই বাতাসা? কে দিল, কোথা থেকে এল!

ফেরার পথে আমরা ছোলা আর শসার টুকরো মুখে দিলেও, প্রথমে বাতাসা খাইনি। মন কেমন খুঁতখুঁত করছিল। মনে হচ্ছিল, বাতাসাগুলো যেন ভুতুড়ে। খেলে অসুখ করে যেতে পারে। হয়তো পেটব্যথা করবে, বা বমি করতে শুরু করব। কী জানি, ওর মধ্যে কী আছে!

বিরজুর সাহস বেশি। বলল, "সাধুবাবার পেরসাদ; না খেলে পাপ হবে। দাঁড়া, আমি খেয়ে দেখি।"

বিরজু বাতাসা খেল। বলল, "ঠিক হ্যায় রে। খেয়ে নে।"

আমরা সাহস করে বাতাসা খেলাম। একেবারে স্বাভাবিক স্বাদ। পেটব্যথা করল না, বমিও হল না।

তারপর ক'টা দিন কেটে গেল। আমরা দিব্যি সুস্থই থাকলাম। তা হলে আর ভয় কীসের!

ভয় নয়, কৌতূহল আর বিস্ময় বেড়েই চলল।

কথাটা রটতেও লাগল আমাদের মুখে মুখে।

সেদিন ক্লাবে বুলুদা এসে হাজির।

"কী রে, তোরা নাকি মহেশবাবার বাতাসা খেয়ে এসেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"বল, শুনি?"

কানু বলল পুরো ব্যাপারটা।

বুলুদা জোরে হেসে উঠল। হাসতেই লাগল।

"হাসছ যে!" কানু বলল।

"তোরা একেবারে ছাগল। আরে এ তো ভাঁওতা, বুজরুকি! ওরে গাধা, হাওয়ায় কি বাতাসা ওড়ে? তা হলে বাজারে আর মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান থাকত না।"

"আমরা যে নিজের চোখে দেখলাম..."

"সেরেফ চালাকি! তোদের চোখকে ঠকানো। ম্যাজিক... আমাদের এখানে কত ম্যাজিশিয়ান এসে খেলা দেখিয়ে গেল—দেখিসনি তোরা! ম্যাজিক মাস্টার মল্লিকের সেই টুপি-নাচ? মনে নেই? ম্যাজিশিয়ানের হাতে তার ম্যাজিক-দড়ি, আর ছড়ির হাতখানেক নীচে তার কালো টুপি ঝুলছে। শূন্যে। সারা স্টেজ জুড়ে ছড়ি নাচাল, সঙ্গে সঙ্গে টুপিটাও দুলে দুলে নাচতে লাগল।"

অন্তু বলল, "ম্যাজিক ম্যাজিকই। সকলেই দেখেছে। মহেশবাবা কি ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন?"

"যা বাব্বা, তোদের আবার এত ভক্তিটক্তি বেড়ে গেল যে!"

কানু বলল, "ভক্তি কেন হবে, চোখে যা দেখেছি—বলছি।"

বিরজু বলল, "বাবার পাওয়ার আছে।"

"কী বললি, পাওয়ার! কীসের পাওয়ার? হর্স পাওয়ার, না, অ্যাস পাওয়ার?" বলে বুলুদা আমাদের ঠাট্টা করে চোখ নামিয়ে হাসতে লাগল। জোরে জোরে।

আমাদের ভাল লাগছিল না। খামোখা লোককে অপমান করা।

ইন্দু টেরচা চোখে দেখছিল বুলুদাকে। ঠোঁটকাটা ছেলে, বলল, "হর্স পাওয়ার কেন হবে, অক্স পাওয়ার। মহাদেব তো ষাঁড়ের পিঠেই বসে থাকে।"

এবার আমরা হেসে উঠলাম।

বুলুদা অপ্রস্তুত! মুখের মতন জবাব পেয়েছে। ধমকে উঠে বলল, "পাকামি করবি না। তিন ফোঁটা ছেলে, মুখে বড় বড় কথা।" বলেই পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করল। নস্যি নিল এক টিপ। "কাল কী হয়েছে জানিস! বাড়ি থেকে বাজারে পাঠিয়েছিল। সবজি বাজারে বাজার করছি, দেখি ওই লম্বু লোকটা, চিমটে, মহেশের চেলা, ঘুরঘুর করছে।"

"চিমটেবাবা!" ইন্দু ফোড়ন কাটল।

"রাখ তোর বাবা! ওই চিমটের কোমরে একটা বড় ঝুড়ি। লোকটা বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরছে, আর ওর লম্বা চিমটেটা দিয়ে এর দোকান থেকে দুটো আলু, ওর দোকান থেকে দুটো পটল, ঝিঙে, কচু, শাকপাতা যা পারছে তুলে তুলে ঝুড়িতে রাখছে। দামটাম দিচ্ছে না। বাবার সেবার জন্যে একটা-দুটো আলু পটল তুলে নিলে দোকানি আর কী বলবে! কিছুই বলছে না। বুঝলাম, ব্যাপারটা দিব্যি চালু করে ফেলেছে চিমটে। বাজারে ওকে চিনে ফেলেছে সকলে।... আর ঝুড়ি সবজি নিয়ে লোকটা কোমরে চিমটে ঝুলিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ—।"

"তুমি সবজির দোকানিদের কিছু জিজ্ঞেস করলে না?" আমি বললাম।

"করলাম তো। ওরা বললে, একটা আলু পটল নিলে কী হয়! সাধুবাবার ভোজনের জন্যে নেয়। নিক। কত লোক তো ফাউ হিসেবে ওজনের বেশি মাল কিনে নিয়ে যায়। উসমে কুছ লোকসান হয় না বুলুবাবু! ধরম করলে মন খুশ থাকে।"

কানু বলল, "চিমটে রোজ আসে বাজারে?"

"না। হপ্তায় এক কি দু'দিন। রোজ রোজ আসা পোষাবে কেন! অতটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে আসা, তার ওপর ঝুড়ি মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ওটা তো আবার একটু লেংড়া...। একদিনেই যা স্টক

করে নিয়ে যায়— তাতে দিব্যি তিন-চারদিন চলে যায় ওদের।"

"আর লোটা?"

"দেখিনি।" বুলুদা উঠে পড়ল। "খাসা জমিয়ে দিয়েছে তোদের মহেশবাবা! মাগনায় পেট ভরছে, আবার দু'পয়সা কামাইও হচ্ছে প্রণামীতে। আজকাল শুনছি ভিড়ও হচ্ছে ভাল ওখানে। দেখিস তোদের না চেলা বানিয়ে ফেলে—!"

বুলুদা আর বসল না। বাইরে সাইকেল ছিল তার। ঘন্টি বাজিয়ে চলে গেল।

ক্লাবঘরে আমরা বসে থাকলুম।

ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল দরজা দিয়ে। ঝিরঝির করে সামান্য বৃষ্টি এসে গেল। শরৎকালের টুকরো মেঘগুলো এইরকমই। কোনওটায় বৃষ্টি হয়, কোনওটায় হয় না।

অন্ধকার হয়ে আসছিল।

আমাদের ক্লাবে আলো বলতে একটা লণ্ঠন। কালিঝুলি মাখা। পরিষ্কার করা হয় না মাসের পর মাস। দরকারও করে না। কেননা সন্ধের আগে-আগেই আমরা উঠে পড়ি। বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে বইপত্র নিয়ে বসতে হয়।

আমরা উঠব উঠব করছি, বিরজু বলল, "বুলুদা যা বলল উ তো ঠিক বলল।"

"কী ঠিক বলল?" অন্তু বলল।

"সাধুসন্তদের লোটা, চিমটা আউর ঝুলিয়ায় হাত লাগাতে নেই।"

"তুই জানিস!" ইন্দু বলল, "চিমটেয় হাত লাগালে হাত ক্ষয়ে যাবে? বাজে কথা। আসলে চিমটে দিয়ে একটা আলু পটল তুলে নিলে কতটুকু নিতে পারে! তাই কিছু বলে না। ওরা কি কম চালাক! চিমটে যদি ফ্রি নেয়, নিক ; অন্য খদ্দেরকে ওজনে ঠকাবে। ব্যালান্স হয়ে যাবে, বাবা!"

অন্তু বলল, "আচ্ছা, ওদের তো চাল আটা ডাল নুন দরকার হয়, সেগুলো কেমন করে নেয়?"

"কিনে নেয়," কানু বলল, "লোকে ভেট দিয়ে আসে! তোদের যত বাজে কথা! বুলুদার কথা শুনলি আর সব বিশ্বাস করে নিলি! ছেড়ে দে বুলুদার কথা! আমরা আর একদিন যাব। মহেশবাবা যেতে বলেছেন না—! কবে যাবি?"

কবে যাওয়া যেতে পারে হিসেব করে আমি বললাম, "আসছে রবিবার চল।"

"রবিবার যদি ভিড় হয়! বুলুদা যা বলল—"

"হলে হবে। ভিড় হলে ভালই! দেখব, ব্যাপারটা কেমন চলছে। লোকে কি এমনি এমনি যাবে! দর্শন করতে যাবে, কিছু চাইতে যাবে, দুঃখকষ্ট জানাতে যাবে। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী! আমরা ছেলেমানুষ—! আমরা কিছু বলতেও যাব না, চাইতেও যাব না।"

অন্তু মাথা নাড়ল। "রবিবার যাওয়া হবে না। বড় মাঠে দারুণ ফুটবল খেলা, দুটো রেলওয়ে টিমের। দেখতে যেতে হবে। তার চেয়ে মঙ্গলবার যাওয়া যেতে পারে।"

খেলার কথা উঠতেই ইন্দু বলল, "আমি ভাই, চান্স পেলে মহেশবাবার কাছে একবার একটা জিনিস চাইব।"

"কী চাইবি?"

"বলব, মহারাজ, হিল সাইড একবার আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে বড় বেইজ্জতি করেছে। সেভেন টু ওয়ান। আপনি আমাদের অন্তত একবার রিভেঞ্জ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। বেশি নয়, ওদের সাতটা গোল দিয়ে দিতে দিন। ব্যস, আর কিছু নয়।"

আমরা হেসে উঠলাম।

অন্তু বলল, "তোর যত ছ্যাঁচড়ামি। খেলা খেলা। একবার হেরেছি তো কী হয়েছে! কোনও হেল্‌প না নিয়েই আমরা জিততে চাই।

আমাদের এখন ক্লাব হয়েছে।"

কানু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক। রাইট। পুজোর ছুটির আগে একটা ম্যাচ তো আছেই। তখন দেখা যাবে।"

ইন্দু বলল, "তোরা দেখিস। আমি মহেশবাবাকে বলব, বাবা, আমাকে জীবনে একবার জিতিয়ে দাও, তাতেই আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।"

আমরা হাসতে-হাসতে উঠে পড়লাম।

মঙ্গলবার স্কুলের ছুটি হয়ে গেল খানিকটা আগে। ভালই হল। বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়া গেল। জলখাবার খেতে হয় বলেই যেন খাওয়া। তর সইছিল না।

দিনটা একেবারে ঝরঝরে। আকাশ তখনও হালকা নীল। আলো রয়েছে। রোদ নিভে আসার মতন আশ্বিনের বাতাস বয়ে যাচ্ছে, মাঠঘাটের গাছপালার পাতা কাঁপছিল বাতাসে। অজস্র ফড়িং উড়ছে।

আমরা সাতজন।

হঠাৎ কানু বলল, "ওটা কে রে?"

তাকিয়ে দেখি, সামান্য দূরে হরীতকী গাছের তলায় লোটা বসে। একমনে কী যেন খাচ্ছে।

কাছে আসতেই লোটা তাকাল। তাকিয়ে চমকে গেল।

লোটার হাতে তার সেই কোমরে ঝোলানো বিশাল ঘটি। এখন অবশ্য তার হাতে।

লোটা লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘটি হাতে দে-দৌড়। বেঁটে বাঁটকুলে লোটা যে অমনভাবে দৌড় মারবে, আমরা ভাবিনি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আমরা, লোটাকে দেখছি। দেখতে দেখতে লোটা গাছপালার আড়ালে হাওয়া হয়ে গেল।

অন্তু বলল, "কী হল রে হঠাৎ! লোটা— ?"

বিরজু বলল, "জরুর ভাঙ খাচ্ছিল, ভেগে গেল।"

"ভাঙ! মানে সিদ্ধি?"

ইন্দু হেসে বলল, "মহেশ মহাদেবের চেলা—নন্দী ভৃঙ্গি, ভাঙ খাবে না!"

কানু বলল, "ভাঙ নয়। দুধ! কাঁচা দুধ। মুখে ঠোঁটে সাদা দাগ দেখলি না! ওই ঘটি ভরতি কাঁচা দুধ খেলে লোটা মরবে।"

বিরজু বলল, "আরে রাখ। কুছ হবে না। ক্যায়সা ভাগলো দেখলি না!"

আমরা সত্যিই ওর দৌড় দেখে অবাকই হয়েছিলাম।

ইমলি তালাওয়ের কাছে আসতেই চোখে পড়ল, মহেশ মহারাজের আস্তানার কাছে জনাকয়েক লোক বসে আছে। একপাশে একটা গোরুর গাড়ি। ছায়া নেমেছে গাছতলায়। চিমটে সামান্য তফাতে কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়ে। কাঠকুটো টুকরো করে নিচ্ছে। এই কাঠের টুকরো দিয়েই ওদের উনুন জ্বালাতে হয়। ধুনিও জ্বলে।

মহেশ মহারাজ দাওয়ার সামনে আসন করে বসে।

তাঁর মুখোমুখি যারা বসে আছে, সবাই মহারাজকে দেখতে এসেছে। সঙ্গে ভেট। একপাশে পাঁচরকম পেট ভরাবার জিনিস পড়ে আছে, ভেটের সামগ্রী।

যারা বসে ছিল তাদের জন্যে মাটিতে মাদুর পাতা। ছেঁড়া ময়লা মাদুর। এরা দেহাতি মানুষ। গোরুর গাড়ি চেপে সাধুদর্শনে এসেছে।

মহেশজি আমাদের দেখতে পেয়ে একটু হাসলেন। তারপর ইশারায় বসতে বললেন।

আমরা বসলাম একপাশে।

লোকগুলোকে উনি ধর্মকথা বোঝাচ্ছিলেন। দান-ধ্যানের গল্প। আমাদের তখন মন সত্যি অন্যদিকে, চোখ আশপাশ দেখছে। লোটা কোথায়? সেই যে ছুট মেরে পালিয়ে এল, তারপর গেল কোথায়?

শেষে লোকগুলো মহারাজকে গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে পড়ল। যাওয়ার সময় একজনকে দেখলাম, দাওয়া থেকে ছোটমতন একটা বালতি—অ্যালমিনিয়ামের, উঠিয়ে নিল।

ইন্দু কানে কানে বলল, "দুধের বালতি। গায়ে দুধ লেগে আছে।"

লোটা কি তবে চুরি করে এই দুধ খাচ্ছিল!

গোরুর গাড়ি করে ওরা ফিরে গেল।

মহেশ মহারাজ আমাদের দিকে তাকালেন। হাসি-হাসি মুখ।

"কী রে, তোরা চুপ হয়ে আছিস! ভাল আছিস?"

"হ্যাঁ মহারাজবাবা।"

"ওরা দরশন করতে এসেছিল। গাঁ গাঁইয়ার মানুষ। সাদাসিধে। তো আমি বললাম, আমায় দরশন করে কী হবে রে! আমি কে? ছোটামোটা সাধু। আমার গুরুজি ছিলেন বড়া সাধু।" বলে দু'হাত তুলে গুরুজির উদ্দেশে প্রণাম করলেন। "ওঁ শিবঃ শিবায়..."

"আপনার গুরুজি কে ছিলেন?" কানু বলল।

"খাটিয়াবাবা!"

"খাটিয়াবাবা? মানে শোয়ার খাটিয়া? চারপাইয়া—?" কানুর চোখের পাতা আর পড়ে না। আমরাও অবাক!

মহারাজ মহেশ মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, "হাঁ রে, হাঁ। গুরুজির নাম ছিল স্বামী সৎ মাধবানন্দজি। তো গুরুজি কন্‌খলসে আরও দূর চলে গেলেন। পাহাড়, বরফ। কোথাও কুছ নেই। গুরুজি

একটা গুহায় থাকতেন। ধুনি জ্বলত। সাধনা চলল পাঁচ বছর। পাঁচ বছর পর খাটিয়া মিললো। খাটিয়ায় বসে দু' বছর নাম জপ। আরে তোরা কী জানবি! গুরুজির খাটিয়া মাটি ছুঁয়ে থাকত না। দেড় হাত ওপরে থাকত...।"

আমরা ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা। মাটি থেকে দেড় হাত উঁচুতে একটা খাটিয়া থাকে কেমন করে? শূন্যে ঝোলে? না কি খাটিয়াটা দোলনার মতন করে ঝোলানো থাকত?

অন্তু বলল, "দোলনা খাটিয়া?"

"না। ঝুলা খাটিয়া নয় রে বেটা।"

"তবে কি খাটিয়ার চারটে পায়ার তলায় ইট পাথরের ঠেকা দেওয়া থাকত?"

"ঠেকাউকা কুছ থাকত না।" বলে মহেশজি যা বোঝালেন তাতে বুঝলাম, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মাধবানন্দজি ওই অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি খাটিয়া সমেত হাতদেড়েক শূন্যে বসে থাকতে পারতেন। দিনে একবার সকালে খাটিয়া মাটিতে নামত, মাধবানন্দ যেতেন পাহাড়ি নদীর তুষারজলে স্নান করতে, বুনো ফুল তুলে আনতে, তারপর গুহায় ফিরে আবার ধ্যানে বসতেন। তাঁর এক চেলা ছিল, সেবা করত গুরুর। সারা দিনে একবার মাত্র একটা বুনো ফল আর ভুট্টার একটা রুটি খেতেন। এইভাবে আরও তিন বছর চলল।

ইন্দু বলল, "তারপর?"

মহেশজি বললেন, "গুরুজি পাহাড়সে নীচে নেমে এলেন। ঘুরতে ঘুরতে কাশী। কাশীতে মাঝগঙ্গায় একটা ছোট বজরায় থাকতেন। রামগড়ের রাজা দিয়েছিলেন গুরুজিকে। এই বজরাতেই গুরুজির তিরোধান হল।"

আমি বললাম, "কত বছর বয়েসে?"

"আশি, বিরাশি...।"

"আর সেই খাটিয়া?"

"গঙ্গাজিতে ফেলে দিলাম।"

পিন্টু বলল, "আপনি সেই খাটিয়া..."

"আরে রাম রাম। আমি তো মাচ্ছড়। শোন, তিন জনম করত্তি যোগ জপ তপ তন কসহী—যোগ জপ তপস্যা সাধনা করলে তবে একজন সাধু হয়। খাটিয়া বাবার সাধনা ছিল তিন জনমের বেশি।"

অন্তু কিছু বলতে যাচ্ছিল, মহেশজি হাত নেড়ে বাধা দিলেন। "আরে ছোড়। তোরা এখন বাচ্চা আছিস, সাধন ভজনের তোরা কী বুঝবি!...কুছ খাবি তো?" বলেই লোটাকে ডাকতে লাগলেন, "লোটা, এ লোটা—?"

লোটার কোনও সাড়া নেই। সেই যে আমাদের দেখে সে পালিয়েছে—তারপর থেকে তাকে আশেপাশে কোথাও দেখছি না।

"অ্যাই চিমটা?"

চিমটে কাঠ কাটা থামিয়ে সাড়া দিল।

মহেশজি চেঁচিয়ে বললেন, "আরে, লোটা কাঁহা গেল—লোটা?"

"মালুম নেই।"

"দ্যাখ...লোটা যায় কোথায়?"

কাঠ কাটা ছেড়ে চিমটে লোটাকে খুঁজতে গেল।

আমরা বসে থাকলাম। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। এবার ওঠা দরকার।

মহেশজি হঠাৎ বললেন, "তোদের শহরে পয়সাঅলা লোক বহুত আছে?"

"বড়লোক?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ! লাখোপতি..."

"অনেক নেই। কিছু আছে।"

"রামেশ্বরজি, আশুবাবু, গুপ্তাজি..."

"আরও আছে। কেন?"

"রামেশ্বরজি একজন লোক পাঠাল। বলল, পাঁচশো টাকা দেবে, মন্দির মেরামত করে নিতে। ....তো আমি বললাম, টাকা আমি নিই না। বাবুরা নিজেরা মেরামত করিয়ে নিন।"

কানু বলল, "আপনি তো মন্দিরের পাশেই আছেন।"

এমন সময় ভেতরের দিকে একটা চেঁচামেচি গন্ডগোল শোনা গেল।

মহেশজি তাকালেন।

লোটা আর চিমটের গলা। দু'জনে ঝগড়া করছে।

"কী হল রে? এ লোটা, এ চিমটে।" মহেশ মহারাজ নিজেই উঠে পড়লেন।

ভেতর থেকে প্রায় কুস্তি করতে করতে লোটা আর চিমটে দাওয়ায় এসে ছিটকে পড়ল।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মহারাজজিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তারপর এক হুঙ্কার।

লোটা আর চিমটে গা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল।

"কী হয়েছে রে?"

চিমটে বলল, "চোর কাঁহাকার। লোটা চুরি করে লাড্ডু খাচ্ছে।"

লোটার চোখ লাল। মনে হল, গুঁতো খেয়েছে চোখে, মারপিট করার সময়। কাঁদতে লাগল।

মহেশজি কড়া চোখে তাকালেন। তারপর দাওয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "নাক লাগা, উল্লু। বিশবার।" মানে, লোটাকে এখন কুড়িবার মাটির দাওয়ায় নাক ঘষতে হবে।

লোটার সাধ্য কি গুরুর হুকুম অবহেলা করে। বেচারিকে মাটিতে বসে পড়তে হল।

মহেশজি বললেন, "নাক লাগা, আমি আসছি।" উনি ঘরে চলে গেলেন।

চিমটে বারকয়েক দেখল লোটাকে, তারপর নিজের কাজে চলে গেল। লোটা মাটিতে নাক ঘষতে লাগল।

অন্তু নিচু গলায় বলল, "লোটা তখন চুরি করে দুধ খাচ্ছিল রে! ওই যে যারা এসেছিল মহারাজকে দেখতে, তাদের একজন একটা ছোট বালতি নিয়ে ফেরত গেল দেখলি না। দুধের বালতি। মহারাজের সেবায় দিতে এসেছিল।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল মোটামুটি। দুধের পাত্র দাওয়ায় পড়ে থাকবে কেন? আটা, ডাল, তেল, নুন নয় যে, পরে গুছিয়ে তুলে নেবে। লোটা নিশ্চয় দুধের পাত্রটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে অন্য কোনও বাসনটাসনে ঢেলে রেখেছিল। পরে সুযোগ বুঝে নিজের লোটায় ঢেলে নিয়ে পালিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে বলে। আহা, বেচারি! হলই বা গুরুর চেলা, তা বলে একটু দুধ, দুটো লাড্ডু লুকিয়ে চুরি করে খেতে পারবে না!"

মহেশজি ফিরে এলেন। হাতে কয়েকটা কমলালেবু।

"নে রে, আধা আধা করে খেয়ে নিবি।"

বিরজু এগিয়ে গিয়ে লেবু নিল।

আমরা চলে যাব, মহেশজি কাছে ডাকলেন, "আয়, নাগিচ আয়, শিরে হাত রাখি। তোরা আমার পেয়ারের বালবাচ্চা।"

মহেশজি আমাদের মাথায় হাত রাখলেন। দেখি মাথার চুলে, কপালে, নাকে কী যেন ঝরে পড়ল ছাইয়ের মতন।

আমরা নাক চুল ঝাড়তে যাচ্ছি, মহেশজি তাড়াতাড়ি বললেন, "আরে, আরে—কী করছিস। ঠাকুর দেবতার বিভূতি শিরে

নিয়েছিস, ফেলতে নেই বেটা। পাপ হয়।"

বিভূতি মাথায় নিয়ে ফেরার সময় কমলালেবু ভাগ হল।

কানুই প্রথমে লেবুর কোয়া মুখে দিয়েছিল। দিয়েই বলল, "কী টক রে।" বলে থু থু করে ফেলে দিল। আমাদেরও একই অবস্থা। বিরজুই শুধু বিশ্রী মুখ করে লেবু খেতে লাগল।

শরৎকালে আকাশের ধবধবে সাদা তুলোট মেঘগুলো যেমন ভেসে যায় দেখতে-দেখতে, ভাদ্র-শেষের দিনগুলোও কখন ফুরিয়ে গেল। এমনকী আশ্বিন মাসের আট-দশটা দিনও। সামনেই পুজো। আর মাত্র বিশ-বাইশটা দিন। পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে মধুগঞ্জে। আমাদের পাড়ায় যে-পুজোটা হয়— তার নাম শিমুলপাড়ার পুজো। আর-একটা পুজো হয় পুরনো বাবুপাড়ায়। এ-পাড়ার পুজোর প্রতিমা গড়া চলছে। মাটি চাপানো হয়ে গিয়েছে খড়ের ওপর, মা দুর্গার কাঠামো প্রায় শেষ।

মনের টান পুজোর দিকে, ওদিকে আবার স্কুলের পরীক্ষা। আমাদের স্কুলের একটা নিয়ম ছিল। গরমের ছুটির আগে আগে হাফইয়ারলি পরীক্ষা হত, আর ডিসেম্বরের গোড়ায়-গোড়ায় অ্যানুয়েল। মাঝে পুজোর ছুটির আগে আধাআধি একটা পরীক্ষা হত, যাকে আমরা বলতাম ক্লাস টেস্ট। মাত্র ক'টা আসল বিষয়েরই পরীক্ষা হত, যেমন অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা। হিন্দির ছেলেরা দিত হিন্দির পরীক্ষা।

এই সময়টায় পড়াশোনার ইচ্ছে থাক না থাক, বইখাতা নিয়ে তো

বসতেই হত। উপায় কী!

ক্লাব তখন ফাঁকা-ফাঁকা থাকত।

তা সেদিন, শনিবার, আমরা অনেকেই ক্লাবে রয়েছি, দুটো পরীক্ষা শেষ, মাত্র একটা বাকি, মন হালকা। প্রতিমা গড়া কতটা এগিয়েছে দেখে ফিরে এসেছি সবে। গল্প হচ্ছে গণেশের ভুঁড়ি, সিংহের মোটা মোটা ঠ্যাঙ নিয়ে, আমাদের পাড়ার প্রতিমায় সিংহটা কোনওদিনই তেজিয়ান হয় না। ঠ্যাঙ মোটাই হোক আর যাই হোক। সিংহের ঠ্যাঙ মোটা হলে সে তো হাতির মতন হয়ে যায়।

এমন সময় বুলুদা এসে হাজির। হাতে গরম পকৌড়া।

"নে, খা...! লছমন আজ নিজে দোকানে বসেছে। না, মার্ভেলাস বানিয়েছে রে!"

আমরা পকৌড়া নিলাম।

"তোদের গুরুজির খবর শুনেছিস?"

"আমাদের গুরুজি! মানে মহেশজি?"

"আমি আর জয়দেব কাল গিয়েছিলাম। সাইকেল নিয়ে," বুলুদা বলল। "গিয়ে দেখি, মেলা জমিয়ে ফেলেছে।"

"মেলা?"

"মেলা মানে—ইয়ে ডুগডুগির মেলা নয়, 'মাঘাইয়া' নয়, তোরা কিছু বুঝিস না। ছাগল একেবারে। বলছি, লোকজনের জটলা। তা দশ-পনেরোর বেশিই হবে। সবাই বেশ ভক্তিটক্তি নিয়ে বসে আছে। আমাদের জেন্টুলম্যানরাও দু-চারজন আছেন। বাবুপাড়ার নিমাই মিত্তির, হরিজেঠা, আবার আমাদের পাড়ার কালীমামা, দাসবাবু...।"

পকৌড়াটা সত্যি ভাল। ডালবাটার সঙ্গে পিঁয়াজ লঙ্কাবাটা মিশিয়ে লছমন যে বড়ি সাইজের পকৌড়া করে, তার তুলনা নেই। আমরা যে যত পারছি তুলে নিচ্ছি পকৌড়া। বেশ গরম।

ইন্দু হেসে বলল, "তোমরা কি মহেশজিকে পকৌড়া খাওয়াতে

গিয়েছিলে?"

"ধ্যাত, তুই একটা গাধা। সাধুরা পিঁয়াজ খায়!"

আমরা হেসে উঠলাম।

বুলুদা বলল, "দেখতে গিয়েছিলাম। এটা আমার সেকেন্ড টাইম। প্রথমবার একটা চক্কর দিয়ে চলে এসেছিলাম। দূর থেকে দেখেছি। এবার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।"

"বসলে না?"

"না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম তোদের গুরুজি লেকচার দিচ্ছেন। বলছেন: আরে বাবুয়া লোক, সাধুসন্তকি বাত ঝুটা হয় না। তো সে হাজার- হাজার সাল আগে মহাপ্রলয় যব হয়ে গেল তব কী ছিল! কুছ না। নারায়ণজি বটপাতায় শুয়ে-শুয়ে জলমে ভাসছিল। ভাসতে-ভাসতে একদিন সাধ হল নারায়ণজির, তীরথ স্থান বানাবেন। তো কাশী তৈয়ার করে নিলেন। নিয়ে মহাদেবকে বললেন, এই কাশী তোমার, আমি বৃন্দাবন যাব। তো কাশীধামে একবার এক খেপা রাগী সাধু এল। বহুত তপস্যা করেছে। তেজী মহাপুরুষ। সাধু এসে বললেন, মহাদেব আবার কে? আমিই কাশীতে থাকব। পূজা আমার হবে। শুনে মহাদেব তো হাসলেন। বললেন, মুনিজি ক' যুগ তপস্যা করেছ তুমি? ক' জনম? মুনি বলল, দো যুগ ধুনি চাড়ায়া, এক জনমকা সাধ্না। শুনে হো-হো করে হেসে মহাদেব বললেন, তবে তো তুম্ চুহা।"

"ইঁদুর?"

"একেবারে নেংটি ইঁদুর। বলে মহাদেব তার লেজটি ধরে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। জলে ভাসতে-ভাসতে মুনি গন্...।"

আমরা হেসে উঠলাম।

বুলুদা বলল, "এমন সময় কী হল জানিস? জয়দেব আমায় কনুই দিয়ে গুঁতো মারল। আমি দেখলাম তোদের মহারাজ ভুল বলছেন।

তখন শুধরে দেওয়ার জন্যে বিনয় করে বললাম, মহেশজি পুরাণে অন্য বাত বলে। বলে, এক জনমের সাধনায় মানুষ চিট্‌টা—মানে পিঁপড়ে হয়, দু'জনমে খটমল্, তিন জনমে চুহা, চার জনমে বিল্লি...। আমায় আর সাত পর্যন্ত এগুতে দিলেন না মহেশজি। দু'-চার পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'শাবাশ বেটা। তু পুরাণ জানিস? ঠিক আছে, পরে বাতচিত হবে। এখন বোস।' "

কানু বলল, "তুমি মহেশজিকে বললে অত কথা?"

"বললাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তখন তো জানতাম না, পরে পস্তাতে হবে।"

"পস্তাবে কেন?" আমি বললাম।

"তাই তো বলছি। মহেশজিকে যারা দর্শন করতে এসেছিল তারা তো চলে গেল। যাওয়ার আগে মিছরিদানা আর কিশমিশ প্রসাদ পেল। আমাদের থাকতে বলেছিলেন মহেশবাবা। সকলে চলে গেলে আমাদের দু'জনকে কাছে ডাকলেন তোদের গুরুজি। হাসি-হাসি মুখ। দু' হাতে তালি বাজিয়ে ভজনের সুরে কী গাইলেন। লোটা আর চিমটেকে ডেকে কিছু বললেন ফিসফিস করে। ওরা চলে গেল। আমাদের বললেন, 'তোরা বহুত লেখাপড়া শিখেছিস! কাজকাম করিস কিছু। দেখি তোদের হাত।'...আমরা হাত পেতে দিলাম। মহেশ ঝুঁকে পড়ে হাত দেখতে-দেখতে বললেন, 'আরে এ ছোকরা, কী নাম তোর?' বললাম, 'বুলু।' মহেশ বললেন, 'তুই পয়সা কামাবি মুঠিয়া ভরতি। রাখতে পারবি না। তোর দৌলত হবে, মাগর শেষতক তুই ফকির হয়ে যাবি। দানধ্যান করবি।...আর তুই? কী নাম তোর? জয়দেব। তোর বিজনেস! লছমি তোর হাতে বেটা। ষাট সাল পার করে একটা ধাক্কা আছে। উতরে যাবি। তুই সাদাসিধে থাকবি। পয়সা ওড়াবি না।' "

"তোমরা কী বললে?"

"কিছু বললাম না। ওঁর বোলচাল শুনছিলাম। একবার ভাবলাম বলি, 'মহারাজ, আমি কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে টরে-টক্কা পাশ করে চাকরির ধান্দায় বসে আছি। রেলে ডাক পাব কবে কে জানে! বাবার হোটেলে দিন কাটছে। আর জয়দেব বিজনেস করবে কী! ওর হিসেবজ্ঞান নেই, আলু-পটল কিনতে গেলে ঠকে যায়!' "

কথাটা অবশ্য ঠিক। জয়দেবদা ভীষণ গোবেচারি মানুষ। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে নেয়।

বুলুদা বলল, "তারপর আমরা যখন উঠব-উঠব করছি, মহেশ দু' হাতে তালি বাজিয়ে একটা পেঁড়া বার করলেন। ভাগাভাগি করে দিলেন আমাদের। প্রসাদ। বললেন, 'খেয়ে নিবি।' হাতে নিয়ে দেখি কর্পূরের গন্ধ।"

"খেলে?"

"মুখে দিলাম। গয়ার পেঁড়া বলে মনে হল।...উঠে পড়ে চলে আসছি, হঠাৎ মহারাজ বললেন, 'এই মন্দিরটা কবেকার জানিস?' জানি না। মাথা নাড়লাম। অনেক পুরনো।"

"মহারাজ হঠাৎ মন্দিরের কথা তুললেন কেন? আমাদেরও বলেছিলেন মন্দির সারাবার জন্যে কে টাকা দিতে চেয়েছিল, উনি নেননি।"

বুলুদা বলল, "তারপর শোন কী হল? বারকয়েক মন্দিরের কথা তুললেন। আমরা ভেতরটা দেখেছি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম, 'ভাঙা মন্দির, ভেতরে সাপখোপ কত কী আছে—কোন সাহসে দেখব! কেউ দেখে না। আমরাও দেখিনি।' বলে চলে আসছি। সাইকেল তুলে নিয়ে চড়তে যাব—দেখি আমার সাইকেলের সামনের চাকায় হাওয়া নেই। আর জয়দেবের সাইকেলের পেছনের চাকায়। দুটোই চুপসে গেছে। ব্যস হয়ে গেল। বোঝ ঠেলা।"

"চাকার হাওয়া..."

"ওই বেটা লোটা আর চিমটের কীর্তি! বুঝতে পারলাম, গুরুর পরামর্শে ওই চেলা দুটো আমাদের টাইট দিয়েছে।"

"মহেশজিকে বললে না?"

"কোথায় তোর মহেশজি! তালাওয়ে চলে গিয়েছেন। কী ডেঞ্জারাস লোক রে! সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে বাড়ি ফিরলাম।"

আমরা হাসতে লাগলাম।

বুলুদা বলল, "এক মাঘে শীত পালায় না। দাঁড়া, দেখবি আমি কী করি! ওই বেটা চিমটে বাজারে এলে ষাঁড় লেলিয়ে দেব। ওটার যা চেহারা আর সাজ, ষাঁড়ের চোখে পড়লেই হল একবার!"

বুলুদা ষাঁড় লেলিয়ে দিলে চিমটের অবস্থা যে কাহিল হবে, সন্দেহ নেই।

উঠে পড়ল বুলুদা।

"মহেশবাবাজির হঠাৎ মন্দির নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন বলতে পারিস?"

"না।"

"খোঁজ লাগাতে হবে।...ভাল কথা, আমাদের এদিকে ছিঁচকে চোর বেরিয়েছে জানিস?"

"না।"

"প্রায়ই থালাবাটি, বাইরে শুকোতে দেওয়া কাপড়জামা চুরি হচ্ছে। কে চুরি করছে, ধরতে হবে। এ-বেটা নতুন আমদানি। একবার ধরতে পারলে বেটাকে দেখিয়ে দেব!"

ইন্দু বলল, "বুলুদা, ছিঁচকে চোর কোথায় না থাকে! তার ওপর পুজোর সময়...।"

"ছিঁচকেরাই পরে পাকা হয়।" বুলুদা একটা ধমক মেরে বেরিয়ে গেল। ক্লাবের মধ্যে ততক্ষণে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মহালয়া পেরিয়ে গেল।

আমাদের স্কুলের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে, পাড়ায়, বাজারে পুজোর হইচই লেগে গিয়েছিল। মা কাকিমারা ঘরদোর পরিষ্কার করে এখন ছেলেমেয়ের নতুন জামাকাপড়ের পুঁটলি নিয়ে বসেছেন, নিজেদের শাড়ি জামার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে কতরকমের গল্প। বাবা-কাকারা ঘর-বাজার করছেন ফর্দ নিয়ে। বাজারে ভিড়। পুজোমণ্ডপে বাচ্চাকাচ্চাদের কলরোল আর ছুটোছুটি। সতুকাকাদের গ্রামোফোনের দোকানে পুজোর রেকর্ড বাজছে : 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।'

আমাদের ক্লাবের ধুলোময়লা সাফ করার পর ঠিক হল, এবার মহেশ মহারাজের কাছে যেতে হবে। পুজোর আগে একবার ঘুরে আসা উচিত। যে যাই বলুক, মহারাজ কিন্তু আমাদের পছন্দ করেন।

কানু বলল, "পুজোর আগে শুধু হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না। কিছু নিয়ে যাওয়া দরকার।"

কিন্তু কী নেব?

আমরা ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ি, আমাদের হাতে টাকাপয়সা কই যে, কিছু কিনে নিয়ে যাব!

অন্তুই মাথা ঘামিয়ে একটা উপায় বার করল। আমরা যে যার বাড়িতে গুরুজনদের বলে দু-এক টাকা করে চেয়ে নেব। নিদেনপক্ষে আধুলি। আজ একটা টাকার দাম নেই। তখন ছিল। পাঁচ-সাত টাকা খরচ করলে বাড়িতে বড় করে সত্যনারায়ণের পুজো

হয়ে যেত।

তা সে যাই হোক, চাঁদা করে হাতে যা জমবে— তাই দিয়ে আমরা মহেশজির জন্যে ফলপাকড় মিষ্টিমাষ্টা যা পাওয়া যায় কিনে নিয়ে তাঁর কাছে যাব। ভেট নিয়ে কত লোক তাঁকে দর্শন করতে যায়, আমরা না হয় সামান্য প্রণামীই দিলাম তাঁকে! উনি খুশি হবেন।

পঞ্চমীর দিন বিকেলে ফুলদানি ক্লাবের মেম্বাররা মহারাজ মহেশের জন্যে শশা, কলা, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, খেজুর—যা যা জুটল কিনে ছোট একটা পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে ইমলি তালাওয়ের দিকে পা বাড়ালাম। এক হাঁড়ি—ছোট হাঁড়ি, পান্তুয়াও ছিল, রাম হালুইকরের বিখ্যাত পান্তুয়া। মুখে দিলে চোখ বুজে আসে আরামে।

জটলা করতে করতে চলেছি আমরা। আকাশ ফিকে নীল, ফুরফুরে বাতাস, মাঠে সবুজ ঘাস, ঝোপে ঝোপে ফড়িং আর প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। পাখি উড়ছে, উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে ইমলি তালাওয়ের দিকে।

যেতে যেতে আমাদের হাসি-তামাশা কত! ইন্দু আর পিন্টু গান গেয়ে উঠল একবার। কানু বলল, "লোটা আর চিমটেবাবার জন্যে দুটো গামছা কিনে নিয়ে গেলে হত! ওদের কাঁধে যে চিট গামছা থাকে তার যা গন্ধ!" বলে হেসে উঠল।

মহেশজির আখড়ার কাছে গিয়ে আমরা অবাক!

ওঁর আস্তানার সামনের মাঠটুকু যেন তকতকে মেঝে। ঘাস নেই, আগাছা নেই, সুন্দর করে কারা যেন একটা মাটির চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ওখানেই দেখি, বাঁশের খুঁটি পোঁতা। মনে হল, হালকা শামিয়ানা বা কাপড় দেওয়া হবে মাথায়। ব্যাপারটা কী? মহেশ মহারাজ কি এখানে নিজের মতন করে দুর্গাপুজো করবেন নাকি?

চিমটেকে দেখা গেল।

বিরজু ডাকল। বলল, "এ চিমটাবাবা, রাম রাম।"

চিমটে কাছে এল। তার হাত-পা ধুলোয়, নোংরায় ভরা।

"মহেশজি কাঁহা?" বিরজু বলল।

চিমটে হাত দিয়ে মন্দিরের দিকটা দেখাল।

আমরা আগেই লক্ষ করেছিলাম, আবার দেখলাম—মহেশজি যে ঘরটিতে তাঁর আস্তানা করে নিয়েছেন—তার দেওয়ালে চুনের পোঁচড়। মন্দিরের সামনের দিকেও আলগা চুনকাম করা হয়েছে।

"লোটুয়া কোথায় চিমটেজি?" ইন্দু হেসে বলল।

"উধার—" বলে মন্দিরের দিকটা দেখাল।

"মহারাজজিকে একবার বলবে, আমরা এসেছি।"

চিমটে ব্যস্ততা দেখাল না। বলল, "উনি এসে যাবেন।" বলতে বলতে চিমটে ইঁদারার দিকে চলে গেল। হাত-মুখ ধোয়ার তাড়া আছে তার।

একটু পরেই দেখি মন্দিরের দিক থেকে মহেশজি আসছেন।

উনি কাছে আসার আগেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, "নমস্তে মহারাজজি।"

হাত তুলে অভ্যর্থনা জানালেন মহেশজি।

উনি কাছে আসতেই কানু পুঁটলিটা তাঁর পায়ের কাছে রাখল।

"কী আছে রে?" মহেশজি বললেন।

"বেশি কিছু নয় মহারাজ, দু-চারটে ফল...। আপনি খাবেন।"

মহেশজি হাসলেন। খুশি হয়ে বললেন, "জরুর খাব। আগে পূজা চড়াব।" বলে আমাদের নিয়ে হাঁটতে লাগলেন সামনের জমিটুকুতে।

অন্তু বলল, "এখানে কী হবে মহারাজ? এত খুঁটি পোঁতা হয়েছে!"

"দশেরা আছে বেটা।"

"ও! আমরা ভেবেছিলাম শামিয়ানা পড়বে।"

"না, না। শামিয়ানায় কিয়া কাম!" মহেশজি মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "খুঁটিতে লাল-নীল কাগজের পতাকা বাঁধা হবে, আচ্ছা দেখাবে। আর এই মাঝখানের জমিতে খড়ের রাবণ পোড়ানো হবে। তোরা দশেরা দেখেছিস?"

"বাজারে দেখেছি। তুলাপটিতে।" অন্তু বলল, "ওরা পাঁচ হাত লম্বা রাবণ পোড়ায়। হল্লা করে।"

মহেশজি হাসলেন। "ওরা মজা করে। পাঁচ হাত দশ হাত বিশ হাত—হিসাবে কুছ আসে না বেটা। তিন হাত ঠিক আছে।...তোরা চলে আসবি, দেখবি।"

"আমাদের যে এখন আর আসা হবে না," বলতে চাইল।

"আপনি মন্দিরেও চুনা লাগালেন?" পিণ্টু বলল।

"হাঁ হাঁ, লাগালাম। পুরা হল না। সামনে লাগালাম। আমার মজুর কাঁহা! লোটা আর চিমটা। ওরাই লাগাল। দেখতে থোড়া আচ্ছা লাগছে না?"

"লাগছে।"

হঠাৎ মহেশজি বললেন, "আরে শোন, রামেশ্বরজি বারবার লোক পাঠাচ্ছেন। এখন বলছেন দো হাজার টাকা দেবেন। মন্দির সাফসুফ করে মেরামতিতে হাত লাগাও।"

"পাঁচশো থেকে দো হাজার!" বিরজু বলল অবাক হয়ে।

"আমি কী বললাম জানিস?"

"কী?"

"বললাম, আরে ও মুনশিজি, তোমার মনিবজিকে বলো, গুরুজির আশীর্বাদে আমি দো তিন চার হাজার কামাতে পারি। ভিখ মাগলে দেওয়ার লোক পাওয়া যায়। দেবতার মরজি হলে মন্দির সারাই হয়ে যাবে। মগর, আমি মন্দির মেরামতি করব কাহে! তোমাদের শহর। তোমরা করো। আমি চার ছ'মাস ইধার থাকব, বাদ

দোসরা কাঁহা চলে যাব।"

"আপনি চলে যাবেন মহারাজ?"

"সাধুদের ঘর থাকে না, মায়া থাকে না।...আমার বন্‌ধন্‌ কাহে থাকবে বেটা। ...আর এক বাত বলি তোদের। উসদিন তোদের কোতোয়ালি—থানা থেকে এক জমাদার এল। মোটা, পালোয়ানের মতন দেখতে। বিল্লির আঁখ নিয়ে সব দেখছিল। মুখে খইনি। বারবার থুক ফেলে।...তো আমি বললাম, কুছ কাম আছে জমাদারজি। কাম না থাকে তো থোড়া আরাম করুন। শরবত খান।... আরে ওই মটকু জমাদার আমায় তেড়িয়া মেড়িয়া বাত বলল।"

"কী বলল?"

"বলল, শহর মে হরদম চোরি হচ্ছে। থানায় গিয়ে লোকে চেল্লায়। দারোগাবাবু খবর লাগাতে বললেন ইমলি তালাওয়ে।"

"এখানে?"

"মটুয়াকে আমি কুছ বললাম না। সিরিফ হাসলাম। বাদমে এক মুঠ্‌ঠি মিট্টি দিয়ে বললাম, 'যা, এই মিট্টি নিয়ে যা, তোর দারোগাসাহেবকে দিবি। বলবি, মহেশজি এই মিট্টি নিয়ে ভাগবে না। আগর ভাগে তো খবর দিয়ে ভাগবে।'...মটুয়া মিট্টি নিয়ে যাবে কী রে। হাতমে মিট্টি দিতেই ওই বোকা মিট্টি ফেকতে গেল। ব্যস, মুঠ্‌ঠি বন্‌ধ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মুঠ্‌ঠি বন্‌ধ মানে মুঠো আর খুলতে পারে না!"

মহেশজি মজার মুখ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। "না। আরে ও কি মুঠ্‌ঠি খুলবে রে, ওর বাপদাদা ভি পারবে না।"

"কেন?"

"তোর হাত রশি দিয়ে বেঁধে দিলে তুই খুলতে পারবি? পারবি

না। আমরা কুছ কুছ মজা ভি জানি রে!" মহেশজি হাসতে হাসতে বললেন। "বাদমে কী হল শোন। পালোয়ান জমাদার আমার গোড় ধরে ফেলল। মাফি মাঙতে লাগল। তো বন্ধন ছুটিয়ে দিলাম। জমাদার ভেগে গেল।"

কানু হঠাৎ বলল, "মহারাজজি, আপনি মন্তর জানেন?"

"ম-ন্ত-র! না, উসব জানি না। গুরুজির কৃপায় থোড়া থোড়া মজা হয়ে যায়। যা চাই সব হয় না বেটা।" বলতে বলতে পেছন ফিরে মন্দিরের দিকে তাকালেন। লোটা আসছে। হাতে কোদাল। ধুলোয় মাটিতে মাখামাখি। ভৃত্যের মতন চেহারা তার। মহেশজি আবার আমাদের দিকে তাকালেন। "আরে কানহাই—" কানুকে বললেন তিনি। আমাদের নামও মোটামুটি জানেন তিনি। "এই মন্দির কিতনা পুরানা, জানিস?"

মাথা নাড়ল কানু। "আমরা কেমন করে জানব!"

"শহরের লোক জানে না?"

"কী জানি! শুনিনি।"

"কেউ জানে না?...জানে। রামেশ্বরজি জানে। পুরা জানে না ; আধা জানে—মালুম। শোন রে কানহাই, শ সালের বেশি, বিশ পঁচিশ সাল বেশি—এই মন্দির বানানো হয়েছিল। মালুম সুরথদেব নাম ছিল রাজার। লড়াইমে হার হল তো রাজা ভেগে আসছিল। এতনা দূর এসে রুখে গেল। ওই রাজা মন্দির বানাতে লাগল। তো বানাতে বানাতে শেষ হল না। রাজা মরে গেল। হাঁ, মরে গেল। উসকো বাদ—?" মহেশজি হঠাৎ থেমে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। যেন তিনি জানতে চান, রাজা মারা যাওয়ার পর কী হল?

পুজো কাটল তো কালীপুজো। দেওয়ালি।

ছোট শহর হলেও দেওয়ালিতে মধুগঞ্জকে বেশ দেখাত। মাটির প্রদীপে তেল দিয়ে আলো জ্বালানো হত বাড়িতে বাড়িতে। সার সার আলো জ্বলত, বাজি পুড়ত হরেক রকম, তুবড়ির ফোয়ারা ছুটত পাড়ায় পাড়ায়। কালীপুজোর হট্টগোল তো ছিলই। তবে সেটা সন্ধের দিকে। ফুলঝুরি আর রংমশাল জ্বালিয়ে বাচ্চারা প্যান্ডেলের সামনে ছোটাছুটি করত। বড়রা নজর রাখত, কেউ কোথাও না ভুল করে আগুন লাগিয়ে বসে।

বাজারের মুখে ছিল এক কালীমন্দির। সেখানে বারোমেসে কালীমূর্তি থাকত, পুজোও হত। কালীপুজোর দিন পুরনো কালীমূর্তি ভাসিয়ে দিয়ে নতুন মূর্তি বসানো হত। বারোমাস ধরে চলত তার পুজো।

এই সময়টায় আমাদের প্রাণ খুলে আনন্দ করার উপায় ছিল না। কারণ সামনেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা। পড়াশোনা না করে উপায় নেই। বাড়িতেও গুরুজনদের তর্জন : ওরে পড়তে বোস, সামনে পরীক্ষা না? ফেল করলে তখন কী হবে!

এতসব ধমকধামক সত্ত্বেও আমাদের ক্লাব রোজই খুলত। এক-আধ ঘণ্টা খেলাধুলো গল্পগুজবের পর বন্ধ হয়ে যেত দরজা। যে যার বাড়ি ছুটতাম।

মহেশজির কাছে আর যাওয়া হয়নি। মানে, একদিন যা গিয়েছিলাম পুজোর পর, তারপর আর যাইনি। সেদিন মহেশজিকে দেখতে পাইনি। তিনি নাকি কোথায় গিয়েছেন, ফিরতে সন্ধে হবে।

চিমটে আর লোটা—দু'জনে দুটো ছোট বাঁশ নিয়ে লাঠি খেলছিল। খেলতে খেলতে জিরিয়ে নেওয়ার সময় দেখি দুটোই বিড়ি ফুঁকছে। এক-একটা বিড়ি দেড় আঙুল লম্বা।

কালীপুজো কেটে গেল। দেওয়ালি ফুরলো। এখন আর হইচইয়ের কিছু নেই। সামনে শুধু পরীক্ষার দুশ্চিন্তা।

সেদিন আমরা ক্লাবে বসে আছি। পিন্টু জ্বর বাধিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধালে আর কার কী করার আছে। শীত পড়ার মুখে এরকম হয় আমাদের। ওকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। বেচারি তাড়াতাড়ি সেরে গেলেই বাঁচি! পরীক্ষা সামনে না?

আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছি, হঠাৎ বুলুদা এসে হাজির। সাইকেল ছাড়া বুলুদা নড়ে না। সাইকেলের ঘণ্টি শুনেই বুঝেছি বুলুদা এসেছে।

ঘরে এসে বুলুদা বলল, "শুনেছিস, তোদের গুরুজিকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"মহেশজিকে?"

"হ্যাঁ রে, মহেশবাবাজিকে।"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন? মহেশজিকে থানায় নিয়ে যাবে কেন?"

বুলুদা বলল, "থানার দারোগা ডেকে পাঠিয়েছিল। মহেশ যায়নি।"

"তা বলে কোতোয়ালিতে ধরে নিয়ে যাবে?"

"দারোগারা সব পারে।"

"কী হল তারপর?"

"শুনলাম, দারোগা নাকি মহেশকে ধমকধামক দিয়ে বলেছে, মাঘাইয়া মেলার আগে বাবাজিকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।"

"কেন?"

"মেলা লাগলে মহেশ গাঁইয়া লোকগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে ভাল কামিয়ে নেবে। চাই কি চেলা বানিয়ে ফেলবে অনেককে। আখড়া পাকা করে নেবে।"

অন্তু বলল, "চেলা না বন্‌লে জোর করে চেলা করা যায়!"

"যায়। ভাঁওতা মারলেই লোকে একেবারে বোকা বনে যায়। ভাবে না জানি সাধুজি কতবড় মহাপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে।... তোদের সে-কথাটা বলিনি বুঝি?"

"কী?"

"আমার সঙ্গে মহেশবাবার একদিন স্টেশনের কাছে দেখা। আমি একটা কাজে গিয়েছিলাম ওদিকে। দেখি তোদের গুরুজি হালুইকরের দোকানের বেঞ্চিতে বসে শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে লালমোহন খাচ্ছে টপাটপ। ফ্রি চালাচ্ছে। আশপাশে দু'-চারজন দাঁড়িয়ে। তারা বাবাজির বড় বড় কথা শুনছে। তো আমি সামনে যেতেই মহেশ হাসিমুখে বলল, 'কী রে? খাবি?' আমি বললাম, 'না। মাগনায় আমি খাই না।' তখন মহেশ তার ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একটা টাকা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। হেসে হেসে বলল, 'তব্ নে বেটা, পয়সা নিয়ে নে। খা।' রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল, কোথাকার এক ঠগ্, আমায় ভিক্ষে দিচ্ছে। আমি বললাম, 'আরে এ মহারাজ, ভিখ তো তোমরা মেগে বেড়াও, আমি কেন তোমার কাছ থেকে ভিখ নেব?'"

"তুমি বললে?"

"বলব না কেন? অত লোকের সামনে আমায় টাকা ভিক্ষে দিচ্ছে।"

"তারপর?"

"মহেশ রাগল না। বলল, 'আরে বেটা—তোর নাম তো বুলুয়া।

তুই না পুরাণ জানিস? তো শুন রে বেটা, একবার শঙ্কর বাবা আর পারবতীজির বাতচিত হচ্ছিল। কৈলাসমে। পারবতীজি বলল, যো ভিখ মেগে খায়—ও গন্ধা কাম করে। ভিখ মাগা পাপ।...শঙ্করজি হাসল। বলল, ভিখ সবাই মাগে।'" বুলুদা একটু হাসল। নস্যি নিল এক টিপ। বলল, "মহেশ টাকাটা নিয়ে ঝুলিতে রাখল আবার। আমায় আর কিছু বলল না। ওর মুখ দেখে মনে হল, আঁতে লেগেছে।"

"তুমি চলে এলে?"

"দাঁড়িয়ে থাকব নাকি! আসবার সময় দেখি, মহেশ উঠে দাঁড়িয়েছে।"

"তারপর?"

"আর বলিস না। মেজাজ খারাপ করে ফিরছিলাম তো, খেয়াল করিনি, রেল ফটকের সামনে একটা ছাগলের দড়িতে সাইকেলের চাকা জড়িয়ে ছিটকে পড়লাম। হাঁটু ছড়ে গেল, হাত কাটল।"

"ছাগল কোথায় পেলে?"

"আরে ওই রেল ফটকের কাছে। ফটকের লোকটা ছাগল বেঁধে রাখে না তার কুঠরির সামনে। ছাগলটা চরছিল, আমি অত খেয়াল করিনি।"

কানু হেসে বলল, "মহেশজির অভিশাপ।"

"ধ্যুত, অভিশাপ। অ্যাকসিডেন্ট অ্যাকসিডেন্টই, অভিশাপের আবার কী! তোরা ভয়-ভক্তিতে এত গদগদ হয়ে থাকিস!"

আমরা চুপ করেই ছিলাম ; বিরজু হঠাৎ বলল, "ইস্, বুলুদা, মহেশজি আবার আমাকে লালমোহন খিলাতো তো পেট ভরকে খেয়ে নিতাম।"

"তুই শুধু খাওয়া বুঝিস! পেটুক কোথাকার!"

কানু বলল, "লালমোহন থাক ; কিন্তু মহেশজিকে থানায় ধরে

নিয়ে যাবে, এ কেমন ব্যাপার হল বুলুদা! মহেশজির দোষ?"

বুলুদা বলল, "দোষটোষ জানি না। কিন্তু ওই লোকটা, মহেশ, দুটো চেলা নিয়ে অত দূরে ইমলি তালাওয়ে মন্দিরের কাছে আখড়া গাড়বে কেন?"

"তাতে ক্ষতি কী হয়েছে! উনি তো নিরিবিলিতেই থাকেন।"

"কেন যাবেন?"

"কেন?"

"মন্দির। ওই ভাঙা পোড়ো শিবমন্দিরটায় ও নজর রেখে বসে আছে। যারা ওখানে যায়, বলে, মহেশ নাকি নিজেই মন্দির সারাতে শুরু করেছে। যেখানে পারছে মাটি খুঁড়ছে। পাথর সরাচ্ছে...। শুনলাম দারোগা নাকি মহেশকে বলে দিয়েছে, মন্দিরে হাত লাগাবে না।"

আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এ তো বড় অবাক ব্যাপার! একটা পুরনো ভাঙা মন্দির এতকাল একপাশে পড়ে ছিল, শহরের কারও কোনও মাথাব্যথা ছিল না মন্দির নিয়ে। মহেশজি এসে ওখানে আস্তানা গাড়ার পর হঠাৎ রামপ্রসাদজি যেচে টাকা দিয়ে মন্দিরটা সারাতে বলছেন মহেশজিকে, থানা থেকে জমাদার পাঠাচ্ছেন দারোগা, তাতেও খুশি না হয়ে নিজেই মহারাজকে থানায় তলব করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা কী!

মহেশজির কাছে আমরা মন্দির সম্পর্কে যে গল্প শুনেছি, বুলুদাকে তা আর বললাম না।

বুলুদা এবার উঠে পড়ল।

"চলি রে! তোদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম। এবার থেকে ওই গুরুজির কাছে যখন যাবি, খেয়াল রাখবি, থানার দারোগার চোখ আছে ওদিকে।"

বুলুদা চলে গেল।

আমরা সবাই চুপ। খারাপ লাগছিল। মহেশাজ কতবড় সাধু, তার কী কী গুণ আছে, তিনি কত পুরাণটুরান জানেন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু মানুষটি যে ভাল তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। উনি আমাদের মতন ক'টা ছেলেকে সত্যিই পছন্দ করেন!

বসে থেকে থেকে আমরাও উঠব উঠব করছি, হঠাৎ বিরজু বলল, "বুলুদা সাচ্ বলল, না, গপ্ বলল, আমি কাল জেনে আসব।"

"তুই?"

"কাল ইমলি তালাও যাব। সাইকেলমে। মহেশজিকে পুছে নেব, থানার দারোগা...।"

কানু বলল, "এখন থাক। পরে যাস্। আমরাও যাব। পরীক্ষাটা হয়ে যাক না!"

বিরজু কথা শুনবে না। তার গোঁ। ও বড় জেদি।

পরের দিন বিরজুর দেখা নেই।

আমরা বুঝতে পারলাম বিরজু ইমলি তালাওয়ে মহেশজির খবর নিতে গিয়েছে।

তার পরের দিন স্কুলে দেখা পেলাম না বিরজুর। ওদের ক্লাস হচ্ছিল চারটে পর্যন্ত। শেষ বিকেলে বিরজু লাফাতে লাফাতে ক্লাবে এল। মুখচোখে উত্তেজনা। এসে বলল, কাল মহেশজির কাছে ও গিয়েছিল। গিয়ে দেখে, মহারাজ আরামসে একটা খাটিয়ার ওপর বসে বসে জটার মতন লম্বা চুল আঁচড়ে নিচ্ছেন। গায়ে একটা চাদর পর্যন্ত নেই। শীতের হাওয়া যেন কিছুই নয়। বিরজুকে দেখে মহেশজি খুব খুশি। আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বিরজু একসময়ে থানার কথা জানতে চাইল।

মহারাজ সব শুনে হাসলেন। বললেন, "হাঁ, হাঁ, তোদের দারোগাজি আমায় থানায় ডেকেছিল। তো গেলাম আমি। লোটা

সাথে ছিল। দারোগা আমায় বইঠতে ভি বলল না। ডাঁটতে লাগল। আমি সব শুনে নিলাম। বাদ মে বললাম, 'আরে এ দারোগা, তু তো আন্‌ধা! বোল বেটা আমার ক'টা আঙলি তুই দেখছিস?' হাত দেখালাম। দারোগা আঁখ মে কুছ দেখতে পেল না। আন্‌ধা। ...বাদ মে আমায় বলল, 'মহারাজ, আমার কসুর মাফ করে দিন।'...দিলাম। বাদমে ওর আঁখ খুলে গেল।"

অ্যানুয়েল পরীক্ষা, ক্লাস প্রমোশন শেষ। বড়দিনের ছুটিও ফুরিয়ে গেল। নতুন বইখাতার গন্ধ শুঁকছি আমরা। কত আরাম আয়েসে দিন কাটছিল কী বলব!

শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে। পৌষমাসের মাঝামাঝি পেরিয়ে গেল। মাঘ মাস পা বাড়িয়ে আছে।

আমরা মহেশজিকে একদফা দেখে এসেছি ক্লাস প্রমোশনের পর। ভালই ছিলেন। গল্প করলেন অনেকক্ষণ।

টাটকা লাড্ডু খাওয়ালেন, গুড় আর বেসমের লাড্ডু। লোটাকে নিয়ে মজা করলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "তোদের 'মাঘাইয়া' মেলা শেষ হলে আমার কামও শেষ হয়ে যাবে রে!"

আমরা বললাম, "কী কাম?"

মহেশজি হাসলেন। "তখন দেখবি, তোরা ভি হাত লাগাস আমার সঙ্গে। আজ যা, আট-দশদিন বাদ আবার আসিস।"

দিনদশেক পরে আবার যখন গেলাম, দেখি মাঘাইয়া মেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঁশের খুঁটি, শালের খুঁটি, ছেঁড়া

ফাটা তেরপল, দড়ি, কোদাল, শাবল ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে এখানে-ওখানে। এই মাঠে বড় মেলা বসবে। প্রতি বছরেই বসে। নানারকম দোকানপাট, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা থেকে খাবারের দোকান, ওদিকে নাগরদোলা, 'দিল্লি দেখো বানারাস দেখো' গোলবাক্স বায়োস্কোপ, ম্যাজিক, কাটা মুণ্ডুর কথা বলার খেলা—কত কী যে আসে মেলায়! এমনকী, কামারশালায় তৈরি বঁটি, দা, ছুরি, হাতা—তারও দোকান বসে যায়। রাত্রে লণ্ঠন, কার্বাইড ল্যাম্প। হ্যাজাক পর্যন্ত জ্বলে কোথাও কোথাও।

এবার গিয়ে দেখি, মাঠে দোকান বাঁধার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। টাঙা, গোরুর গাড়িও এসেছে দু-চারটে। খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। এদিকে মাঘের হাওয়া বইছে শনশন। ধুলোও উড়ছে।

মহেশজি তাঁর আখড়ার সামনে পায়চারি করছিলেন।

আমরা যেতেই বললেন, "আরে শোন, ওই রামেশ্বরজি কাল দুটো আদমি ভেজেছিল। হাতমে ডাণ্ডা। আমায় ভয় দেখাতে এল। বলল, এ মহারাজ ভাগ যা। মেলা তক্ থাকবি না।... আমি বললাম, কাহে রে! তোরা কে রে?"

আমি বললাম, "কেন এসেছিল? ওরা কে?"

"রামেশ্বরজির লাঠিয়াল।"

কানু অবাক হয়ে বলল, "আপনাকে ভাগাতে এসেছিল কেন?"

"আরে, বাত তো শোন। লাঠিয়াল চিল্লাতে লাগল। গালি দিল। তো আমি বললাম, এ পালোহান তোরা লাঠি রাখ দে মাট্টিমে। আগর না রাখবি তো তোদের বাপ ভি বাঁচাতে পারবে না। ওরা আমায় মারতে এল। আমি লোটা আর চিমটাকে হাঁক দিলাম। ব্যাস, ওই লাঠিয়াল দুটো ভেকু হ্যায়। অ্যায়সা মার খেল লোটা আর চিমটার হাতে যে, জখম হয়ে ভেগে গেল। মেলায় যারা বাস করছিল তারা ভি ছুটে এল।"

"লোটা আর চিমটে লাঠি খেলা জানে?" অন্তু চোখ বড়-বড় করে বলল।

"আচ্ছা জানে। লোটা ভোজপুরি লাঠি চালায়, আর চিমটা ছাপরা জিলার ছিপপা মারে।" বলে মহেশ হো হো করে হাসলেন।

লোটা, চিমটা কাউকেই আশেপাশে দেখছিলাম না। কোথায় গিয়েছে ওরা কে জানে! তবে মনে পড়ল, আগে একদিন ওদের বাঁশ নিয়ে লাঠিবাজি করতে দেখেছিলাম। সেটা অবশ্য লড়াই নয়, বোধ হয় প্র্যাকটিস করছিল।

বিরজু বলল, "মহারাজ, মারপিট করলে কোতোয়ালির সিপাহি আসবে।"

"তোদের ঘাবড়াতে হবে না। কোই আসবে না। জমাদার না, দারোগাজি ভি আর আসবে না।"

কথাটা আমাদের বিশ্বাস হল না। মেলা শুরু হওয়ার আগেই থানা থেকে দু-চারটে পুলিশ ঢুঁ মেরে যায়। দোকানপাট কেমন বসছে, জায়গা নিয়ে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে কিনা খোঁজ করে যায় ওরা। সেইসঙ্গে এর-ওর কাছে বিড়ি চেয়ে নিয়ে ফোঁকে, এক-দু'টাকা কামিয়ে নিয়ে যায়। আর মেলার সময় তো তাদের মাগনায় এটা-সেটা নিয়ে যেতে কেউ বাধা দেয় না। কে ঘাঁটাবে তাদের!

মহেশজি নিজেই বললেন, "শোন বেটা, যো ডরসে ভেগে যায় ও বিল্লি। আমি থোড়াই বিল্লি!...তো এক কহানি শোন। একবার বিষ্ণুজি আর ইন্দরজি বাগিচায় বসে খুশ মেজাজে সাতপাঞ্চ খেলছেন।"

অন্তু মাথা চুলকে বলল, "কোন বিষ্ণুজি?"

"আরে তুই বিষ্ণুজি জানিস না! নারায়ণ, কৃষ্ণজি।"

"ও! আর ইন্দরজি বুঝি দেবরাজ ইন্দ্র?"

"হাঁ! ঠিক বাত। খেলতে খেলতে ইন্দরজি বললেন, প্রভু—আমি

দেবতাদের রাজা ; আমি ভি বীর, যুধ্‌মে আমার সামনে কোই আসতে চায় না। তবু ভি আমি কিতনা বার দানবদের কাছ্ থেকে ভেগে গেছি। বহোত শরম লাগে। সেদিন এক নাগরাজ এল। শ' দুশো সাথী নিয়ে। পাতাল সে এল প্রভু! কালা কালা রং, লাল লাল আঁখ। শ্বাস দেয় তো গাছপাতা পুড়ে যায়। নাগরাজ আমায় বলল, আরে দেবরাজ তুই ভাগ যা। আগর না ভাগবি তো তোকে আমরা ভাগিয়ে দেব। পাতালে পাকড়ে নিয়ে যাব।"

কানু গল্প শুনতে শুনতে বলল, "ইন্দ্র পালিয়ে গেল?"

মহেশজি বললেন, "ইন্দ্র দেবরাজ হলে কী হবে, নাগরাজ আর তার সঙ্গী সাপদের দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। নাগরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টাও করলেন না। সিংহাসন ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

"দেবরাজ যখন পালাচ্ছেন, নারদ মুনির সঙ্গে দেখা। নারদ বললেন, 'কী হল দেবরাজ, আপনি এভাবে পালাচ্ছেন কেন?'

"ইন্দ্র বললেন, 'নাগরাজ এসে আমায় তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে নিয়েছে মুনিবাবা। আমি সাপের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করব! আপনি একটা উপায় করুন।'

"নারদ তখন শঙ্করজির কাছে গিয়ে বললেন সব। 'স্বর্গরাজ্য যায় যায়, নাগরা রাজ্য দখল করে নিয়েছে। আপনি একটা উপায় করুন মহাদেব।'

"শঙ্করজি বললেন, 'আচ্ছা চল, দেখছি।'

"বলে মহাদেব নাগদের কাছে এসে ডমরু বাজিয়ে দিলেন। ডমরুর শব্দে নাগরা ভয় পেয়ে গেল। সে কী শব্দ রে—আকাশ বাতাস এসে কাঁপতে লাগল। সাতদিন শঙ্করজির ডমরু বাজল। সাপরা বেহুঁশ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল পথে। তখন উনি বললেন, 'যা। এগুলো নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দে। আর নাগরাজকে শঙ্করজি পায়ে দাবিয়ে মেরে ফেললেন।'"

কানু বলল, "দাবা খেলার কী হল মহারাজ? ইন্দ্র আর নারায়ণ যে বসে বসে দাবা খেলছিলেন।"

মহেশজি বললেন, "ইন্দরজি কী পুছেছিলেন রে?"

"বারবার আমি যুদ্ধে হেরে যাই কেন?"

"বারবার নয়, দানবদের অনেকের কাছে। জবাবে কৃষ্ণজি বললেন, দেবরাজ, তুমি ডর পেয়ে যাও। যো ডর পেয়ে যায়, ও হারে। লড়তে পারে না। তুমি জানবে, ডর পেলে তোমার তেজ আধা হয়ে যায়। পুরা তেজে লড়বে। তাতে ভি হার হয় তো ভি আচ্ছা।"

কথা বলতে বলতে মহেশজি আমাদের তাঁর ঘরের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

জোর হাওয়া বইছিল। আমাদের গায়ে সোয়েটার, তবু শীত করছে। বিকেল মরে আসছিল। শীতের বিকেল।

হঠাৎ মহেশজি আমাদের তালাওয়ের দিকটা দেখালেন আঙুল দিয়ে।

তাকালাম আমরা।

মহেশজি বললেন, "আরে, তোরা তো লিখাপড়াই করিস। ওই তালাও এই মন্দির সে কিতনা দূর আন্দাজ করতে পারিস?"

"আমরা ইমলি তালাওয়ের দিকে তাকালাম।

কানু বলল, "শ' গজ। জাদা হলে সোয়া শ'।"

ইন্দু বলল, "শ' গজের বেশি নয়।"

"তালাওয়ের নাগিচ যাস নি কভি?"

"না।"

"মেলার লোকজন তো ওই তালাওয়ে যায় মহারাজ।"

"পুরা তালাওয়ে যায় না। উধার যায়—" বলে মহারাজ পশ্চিম দিকটা দেখালেন তালাওয়ের।

আমরা অত জানি না। চুপ করে থাকলাম।

"তোরা মন্দির ভি দেখিসনি।"

"না, ভাঙা মন্দিরে কেউ যায় না। কেন?"

মহেশজি বললেন, "তোদের কী বলেছিলাম মনে আছে? রাজা সুরথদেব—!"

মনে পড়ল। তবে স্পষ্টভাবে নয়।

অন্তু জিজ্ঞেস করল, "রাজা সুরথদেব কে মহেশজি?"

মহেশজি বললেন, "রাজা ছিল। ভূমিয়া রাজা।"

সুরথদেব সম্পর্কে আমরা কিছু শুনিনি। তবে জানি, এইসব অঞ্চল শ'-দেড়শো বছর আগে ঘোর জঙ্গল ছিল। জঙ্গল আর মাঝে-মাঝে ছোট পাহাড়। অত জঙ্গল এখন আর নেই। আশেপাশে পাহাড়ের মাথা অবশ্য এখনও দেখা যায়। কালো কালো পাথর, আর গাছপালায় ভরতি।

এককালে এই অঞ্চলগুলো কার দখলে থাকত জানি না। তবে শুনেছি, ছোট ছোট রাজা থাকত। মানে, তাদের আধিপত্য ছিল জমি জায়গায়, বনে জঙ্গলে।

মহেশজি যা বললেন তার থেকে মনে হল, সুরথদেব বলে এক রাজা— এদিকে থাকতেন একসময়। বুনো দেশের রাজা। বা বহু জমিজমা বনজঙ্গলের মালিক। শুধু।

তখন শুধু এইদিকটায় কেন, বহু জায়গায় ছোট ছোট রাজা বা বড় বড় জমিদারদের মধ্যে অনবরত লড়াই হত। অনেক সময় তুচ্ছ কারণে। তবে আসল কারণটা থাকত এলাকার অধিকার বজায় রাখা নিয়ে।

মহেশজি বললেন, "তোদের আগেই বলেছি, সুরথদেব এদিকে কোথাও গিয়েছিলেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি পিছু হটতে হটতে এখানে এসে লুকিয়ে থাকেন।

ছাউনিও ফেলেছিলেন। আর অপেক্ষা করছিলেন সুযোগের। সুযোগ পেলেই আবার তিনি আক্রমণ করবেন শত্রুকে। সেই সময়, সুরথদেব এই মন্দিরটা তৈরি করান। দেবভক্তি তাঁর অবশ্যই ছিল। কিন্তু শুধু দেবভক্তির জন্যে নয়, এই মন্দিরের কোথাও তিনি নিজের কিছু গুপ্তধন লুকিয়ে রাখেন। যাতে সেটা শত্রুর হাতে না পড়ে।"

মহেশ মহারাজ বললেন, "সেই ধনরত্ন এখন কোথায়? আমি তোদের কাছে যা বলছি সেটা গল্প নয়। তোরা দেখবি!"

'মাঘাইয়া' মেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ পড়লেই মাঘের মেলা শুরু হয়ে যায়। চলে পনেরো দিন। কৃষ্ণপক্ষের গোড়াতেই মেলা শেষ।

এবার প্রথম থেকেই আবহাওয়া সুন্দর। বৃষ্টি বাদলা মেঘলা নেই। আকাশ পরিষ্কার। সকাল থেকে রোদ লুটিয়ে থাকছে মাঠেঘাটে, গাছের মাথায়। শীতের হাওয়া কনকনে। সন্ধে নামার আগেই হিমকুয়াশা আর চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র।

মেলা বসতে না বসতেই জমে উঠেছিল। দোকানপত্তরও বেশি। নতুনের মধ্যে এবার দুটো জিনিস চোখে পড়ার মতন। একটা লোক এক হাতি এনেছে মেলায়। মস্ত নিমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে হাতির একটা পা বাঁধা। হাতিটা শান্ত মেজাজের। বাচ্চাকাচ্চার খুব ভিড় গাছতলায়। অবশ্য মাহুতটা হাতি দেখিয়ে পয়সাও নিচ্ছে। যার যেমন খুশি দেয়।

নতুনের মধ্যে অন্যটা হল : ছেঁড়াফাটা তেরপল, ময়লা চট,

নীল-হলুদ কাপড় টানিয়ে মাস্টার হিপো বলে একটা বেঁটে লোক ক্লাউনের খেলা দেখাচ্ছে। বল লোফালুফি, এক চাকার সাইকেল নিয়ে চরকি মারা থেকে ক্লাউনের তামাশা, হরেক রকম। সেখানেও ছোটদের বেশ ভিড়।

আমরা প্রায় রোজই মেলায় ছুটছি। সত্যি বলতে কি, আমাদের শহরে এই মেলা একটা বড়সড় পরব। তা ছাড়া বাড়িতে আটকে রাখার কোনও কারণ নেই। সবে নতুন ক্লাস শুরু হয়েছে। সরস্বতীপুজোর আগে পর্যন্ত পড়াশোনায় কারও কি মন বসে!

বুলুদারা তাদের বন্ধুমহলে সরস্বতীপুজো করে। আমরা সেখানেই যাই। স্কুলের পুজোয় একবার বুড়ি ছোঁয়া করলেই হল। তবে বুলুদাদের পুজোয় আমাদের হইচইটা বেশি হয়।

সরস্বতীপুজোর পরের দিন বুলুদা বলল, "হ্যাঁ রে, শুনলাম তোরা তোদের ওই গুরুজিকে নিয়ে কীসের মতলব করছিস?"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

"কী ব্যাপার রে?"

কানু থতমত মুখ করে বলল, "কীসের ব্যাপার? কিচ্ছু না।"

"কথা লুকোচ্ছিস?"

"না, না," মাথা নাড়ল কানু।

বুলুদা বলল, "শোন, তোদের আগে থাকতেই বলে রাখছি, মেলা শেষ হওয়ার পর তোদের গুরুজিকে আর দেখতে পাবি না। হঠাৎ যেমন এসেছিল, হঠাৎই উধাও হয়ে যাবে। থানার দারোগা ওপরঅলাকে জানিয়ে দিয়েছে, লোকটা সন্দেহজনক।"

আমরা কিছু বললাম না।

বললাম না, কারণ মহেশজির নিষেধ ছিল।

আমাদের সঙ্গে মহেশজির মাখামাখি, ঘোরাফেরা বেড়ে গিয়েছিল এটা ঠিকই। শুধু তাই নয়, মহারাজ আমাদের দুটো অদ্ভুত

জিনিস দেখিয়েছেন। একটা মন্দিরের মধ্যে। অন্যটা ইমলি তালাওয়ের কাছে।

মন্দিরের মধ্যে লোটা আর চিমটেকে দিয়ে বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি, ভারী ভারী পাথর সরানোর পর, সাপখোপ, বিছে, বিষাক্ত পোকামাকড়—যা পাওয়া গিয়েছে—মেরে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন মহারাজ। সেসব আমরা দেখিনি, তবে খোঁড়াখুঁড়ি করতে তো আগেই দেখেছিলাম। তখন কিছু বুঝিনি। ভাবতাম মহেশজি বোধ হয় মন্দির সারানোর কাজে নিজেই হাত লাগিয়েছেন। আগে ভেতরটা দেখছেন, পরে বাইরের কাজে হাত দেবেন।

কিন্তু হালে একদিন মহেশজি আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই, মন্দিরের ভেতরের চত্বর কালো কালো এবড়োখেবড়ো পাথর বসিয়ে তৈরি। কালো পাথরের একটা শিবলিঙ্গও ছিল।

পাথরগুলো দেখাতে দেখাতে এক জায়গায় এসে তিনি লোটা আর চিমটেকে বললেন—ওপরের পাথরটা তুলে নিতে। লোটা আর চিমটে আমাদের সঙ্গেই ছিল। ওদের হাতে ছিল গাঁইতি।

পাথরটা ওরা উঠিয়ে নিল গাঁইতির চাড় দিয়ে। মানে আগেই ওটা আলগা করে রাখা ছিল।

মহেশজি বললেন, "কী দেখছিস?" একেবারে পরিষ্কার বাংলা। একটু হিন্দি টান রেখে বললেন।

আমরা দেখলাম, একটা সাদা পাথর। বাড়িতে মশলাবাটার শিলের মতন। ঠিক চৌকো নয়। মাথার দিকটা তেকোনা ধরনের। বা বর্শার ফলার মতন। বরফির মাথাও বলা যায়। লম্বায় হাত দেড়েক। চওড়ায় পুরো এক হাতও নয়।

"কী দেখছিস রে!" মহেশজি বললেন।

"পাথর। সাদাটে।"

"আর কী দেখছিস?"

নজর করতেই চোখে পড়ল, শিলের মতন পাথরের মাঝখানে একটা ত্রিভুজ খোদাই করা। ছেনি হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে খোদাই করা হয়েছে। ত্রিভুজের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। গভীর নয়।

"নীচে দ্যাখ।"

নীচে একটা লম্বা দাগ। সরলরেখা। খোদাই করা।

মহেশজি বললেন, "লাঙলের ছুঁচলো মুখটা—মানে মাথার দিকটা কোন দিকে রয়েছে দেখে নে। পুব দিকে। পুব দিকে কী আছে? তালাও।"

পাথর দেখানো শেষ হলে লোটাদের বললেন, আবার সব আগের মতন করে রাখতে। মানে আবার উঠিয়ে নেওয়া কালো পাথরটা সাদা পাথরের ওপর চাপা পড়ল।

মন্দির থেকে আমাদের বাইরে এনে মহেশজি বললেন, "কাউকে কিছু বলবি না। আরও একটা জিনিস দেখাব।"

"ওটা কী মহেশজি?"

"চিহ্ন। দিশা।"

"কীসের?"

"পরে জানবি।"

মহেশজি আমাদের ইমলি তালাওয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন এক জায়গায়। হাত তুলে মন্দির দেখালেন। "দেখছিস?"

"হ্যাঁ।"

"মন্দিরের পুব দিক এটা। ঠিক না?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, এইবার হাত লাগা এখানে।"

হাত লাগাব কী! জায়গাটা লতাপাতা আগাছায় ভরা। হাস্নুহানা

গাছের ঝোপের মতন একটা জংলা ঝোপ।

কানুর চোখের জোর আছে। বলল, "মহেশজি, এখানকার মাটি নরম কেন? কতকগুলো কাঁটাগাছের ডাল আর আলগা লতাপাতা চাপা দেওয়া আছে।"

মহেশজি হাসলেন, "ঠিক বলেছিস!" বলে লোটা আর চিমটেকে হুকুম করলেন জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে।

ওরা জায়গাটা পরিষ্কার করল।

মাটি খুঁড়তে বললেন মহেশজি।

আলগা করে মাটি চাপা দেওয়া ছিল। লোটারা মাটি তুলে ফেলল।

মহেশজি আঙুল দিয়ে গর্তটা দেখালেন। দেখলাম, মন্দিরে যেমন দেখেছি—অবিকল সেইরকম একটা শিল-পাথর। তার ওপরেও ত্রিভুজ খোদাই করা। তলায় একটা সরলরেখা। আর ত্রিভুজের মাঝখানে একই রকম একটা গর্ত।

আমরা দেখলাম। অবাক হলাম। কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

"কী দেখছিস?"

কানু বলল, "পাথর। মন্দিরে যেমন দেখেছিলাম।"

"ভাল করে নজর কর।" মহেশজি বললেন, "মন্দিরে যে পাথর দেখেছিস, তার তলায়, ত্রিভুজের তলায় একটা মাত্র লম্বা দাগ ছিল খোদাই করা। এই পাথরটার তলায় তিনটে দাগ আছে। আছে না?"

লক্ষ করে দেখলাম, মহেশজি ঠিক কথাই বলেছেন।

"এর মানে কী মহেশজি?"

মহেশজি বললেন, "এই হল নিশানা। মন্দির থেকে তালাও পর্যন্ত। নিশানার প্রথমটা পেয়েছি। তিন নম্বরটাও পেলাম। খালি দু' নম্বরটা পাচ্ছি না।"

"কী আছে দু' নম্বরে?"

"কী আছে?" বলে মহেশজি মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিজের মনে কথা বলার মতন করে বললেন, "সুরথদেব তাঁর ধনরত্ন কিছু ওখানেই লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে আমার মনে হয়। নিশানা ঠিক হ্যায়।" মহেশজি আবার হিন্দি বুলি আওড়ালেন। "মাগর, দুসরা পাথর কাঁহা মিলেগা?"

আমাদের মুখে কথা আসছিল না। ভাবতেও পারিনি ভাঙা শিবমন্দির আর ইমলি তালাওয়ের কোথাও এত রহস্য লুকিয়ে আছে! মহেশজিই বা সত্যি-সত্যি কী, মামুলি সাধু, না, অন্য কিছু!

তালাও থেকে ফেরার পথে বারবার মহেশজি যা বোঝালেন তার অর্থ হল, মন্দিরের পুব দিকে, লুকোনো পাথরের নিশানা মতন নাক বরাবর ইমলি তালাও আসার কোথাও এক জায়গায় মাটির তলায় দু' নম্বর পাথরটা রয়েছে, আর সেই পাথর সরাতে পারলে আমরা পলাতক রাজা সুরথদেবের সন্তর্পণে ও গোপনে লুকিয়ে রাখা কিছু ধনরত্ন উদ্ধার করতে পারব।

মহেশজি আমাদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, এসব কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা এখন কাউকে বলব না।

বুলুদাকে আমরা তাই একটি কথাও বলিনি।

সরস্বতীপুজো শেষ হল।

মাঘাইয়া মেলার তখন মাঝপর্ব। মানে সপ্তাহখানেক কেটেছে মাত্র। ভিড় বাড়ছে, দোকান পসারে দেহাতি থেকে শুরু করে শহরের লোকজনের ঢল নেমেছে। নাগরদোলা ঘুরছে অনবরত, বেলুন বাঁশির পোঁ পোঁ, তেলেভাজার দোকানে আলুর চপ, বেগুনির কী যে চমৎকার গন্ধ, ক্লাউন খেলা দেখাচ্ছে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। মেলার মাঠে যত ধুলো তত হট্টগোল। হরদম টাঙা ভরতি লোক আসছে। ক'টা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। রাত্রে

দোকানে দোকানে কার্বাইড ল্যাম্পের আলো, আর চারপাশে অঢেল জ্যোৎস্না।

সরস্বতীপুজোর পর আমরা আবার মহেশজির কাছে হাজির?

মহেশজি আগের মতন বললেন, "কী রে? পূজা শেষ?"

"হ্যাঁ।"

"বুলুয়া ইধার দো দিন মেলা দেখতে এল রে!" বলে হাসলেন মহেশ।

আমি বললাম, "আমরা কাউকে কিছু বলিনি মহেশজি। কিন্তু বুলুদা বলছিল, থানা থেকে ওপরঅলাকে খবর দিয়েছে। বড়সাহেব টাহেব চলে আসতে পারেন।"

হাসতে হাসতে মহেশজি বললেন, "তো আসতে দে।... আচ্ছা, আর শোন। তোদের ভি কাম আছে।"

"কী কাজ?"

মহেশজি আমাদের তাঁর আখড়ার ঘরের কাছে নিয়ে গেলেন। মন্দিরটা দেখালেন। তারপর যা বোঝালেন তার সাদামাঠা অর্থ হল, মন্দিরের সামনে থেকে তালাও পর্যন্ত পুব দিকে একটা সিধে দাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যে যে সাদা পাথরটা আছে, নিশানা দেওয়া, সাঙ্কেতিক নিশানা—তার ঠিকঠাক বিন্দু বা পয়েন্ট ধরে একেবারে তালাও পর্যন্ত সরলরেখায় একটা দাগ টানতে হবে। টেনে তার গোড়া, মাঝমধ্যিখান আর শেষ—হিসেব করে তিনটে ভাগ করতে হবে। গোড়া নিয়ে ঝামেলা নেই, শেষ নিয়েও নয়, কেননা, এক নম্বর পাথরটা তো চোখেই দেখা যায়, আর শেষ বা তিন নম্বর পাথরটা মহেশজি নিজেই খুঁজে খুঁজে বার করেছেন। তিনি নিজেও দড়ি বা রশি ফেলে মাপ নিয়েছেন গোটা পথটার, মাঝ জায়গাও বার করেছেন, তবু কোনও একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো গোড়া এবং শেষ দুটি 'পয়েন্ট' মিলে গেলেও

সেটা হিসেব মতন মিলছে না। শেষ বিন্দুটা আন্দাজে ভাগ্যবশত মিলে গিয়েছে। এখানকার মেঠো জমি সমতল নয়, উঁচু-নিচু, টিবিঢাবায় ভরতি। একেবারে পাকা হিসেব দরকার। ঠিকমতন মাঝ জায়গাটা বার করতে পারলে মহেশজি লোটাদের দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে দেখবেন দু' নম্বর পাথরটা পাওয়া যায় কি না। যদি যায়, সেই পাথর ওঠালেই সুরথদেবের লুকিয়ে রাখা সম্পদ পাওয়া যাবে। মহেশজির দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ওই জায়গায় আসল জিনিস পেয়ে যাবেন।

আমরা বললাম, "এখন মেলা চলছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লোকজন, ভিড়। এখন কি এই কাজ করা যাবে?"

মহেশজি বললেন, "যাবে। ইধার কোই আসবে না। আর কোই এসে পড়ে তো আমি দেখব। তোরা লেগে যা বেটা, ঘাবড়াস না।"

আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

মেলা শেষ হয়ে আসছে।

আর মাত্র দুটো কি তিনটে দিন। সকাল থেকেই লোক জমে যায়, দুপুরের পর থেকে লোকে লোকারণ্য। গোরুর গাড়ি আর টাঙায় মাঠের একটা দিক ভরে যায় ; দোকানে দোকানে ভিড়, দরদাম নিয়ে চেল্লাচেল্লি, মেয়ে বউরা কাচের চুড়ির দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, নাগরদোলার কাছে বাচ্চাকাচ্চারা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক হরবোলা হয়ে কতরকম কী ভেবে চলেছে। ক্লাউনের মজা, ম্যাজিকঅলার হরেক রকম খেলা—ওদিকে খাবারের দোকানের হাতছানি—এসব কে আর তুচ্ছ করতে পারে! ভিড় বাড়ে, ধুলো

ওড়ে, কলরবে ভরে যায় মেলার মাঠ।

আমরা কিন্তু রথ দেখা কলা বেচা দুইই করছিলাম। মানে, মেলাও যেমন দেখছি, সেইরকম মহেশজির কাজও করে যাচ্ছি। হাতে লম্বা ফিতে—মাপজোক করার, এক বালতি চুন, লম্বা দড়ি, কোদাল। এমনকী ইন্দু একটা কম্পাসও জুটিয়ে এনেছে, যদিও সেটা আমাদের কাজে লাগছিল না। কোদাল আমাদের হাতে নেই, ওটা লোটার হাতে।

মেলায় যারা আসছে তাদের নজর আমাদের দিকে তেমন নেই। যদি-বা চোখেও পড়ছে—তাদের আগ্রহ নেই জানবার আমরা কী করছি। তা ছাড়া মন্দিরটা তো মাঠের প্রায় শেষ প্রান্তে। ক'টা বাচ্চা ছেলে কী করছে, জানবার কৌতূহল তাদের হবে কেন।

কিন্তু যার নজরে পড়ার সে ঠিক দেখে ফেলল।

বুলুদা তার বন্ধুদের নিয়ে মাঝে-মাঝেই মেলায় আসে সাইকেলে চেপে। ঘোরে-ফেরে। দোকানের বেঞ্চিতে বসে যা প্রাণে চায় খায়।

সেদিন বুলুদা সোজা আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে জয়দেবদা।

"এখানে কী করছিস তোরা?" বুলুদা কোদাল কোপানো আর দাগ দেওয়া দেখতে দেখতে বলল।

আমরা চুপ।

"কীসের দাগ মারছিস? মন্দির থেকে তালাও পর্যন্ত।"

"কিছু না।"

"কিছু না! এমনি! মিথ্যে কথা বলছিস?"

"মিথ্যে বলব কেন?" ঢোক গিলে আমি বললাম।

"কথা লুকোবি না! তোদের গুরুজি নিশ্চয় লাগিয়েছে তোদের। মতলব?"

আমরা বিপদে পড়ে গেলাম। কী বলব! সত্যি কথা তো বলতে

পারব না। মিথ্যেই বা কী বলি!

"তোদের পইপই করে বলেছি, বি কেয়ারফুল, সাবধানে থাকবি। ওই তোদের হামবাগ্ গুরুজির সম্পর্কে রিপোর্ট গিয়েছে থানা থেকে। যে-কোনওদিন সদর থেকে সাহেব এসে পড়বে। বলিনি! তোরা..."

বুলুদার কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথ্ থেকে মহেশজি এসে হাজির।

হাসি হাসি মুখ। মাথার লম্বা চুল খুলে ঝুঁটি বাঁধার ব্যবস্থা করেছেন যেন। আবার গুন্‌গুন করে ভজনও গাইছিলেন।

"কী রে বুলুয়া! মেলা উলায় ঘুমছিস রে?"

বুলুদা কড়া চোখে মহেশজিকে দেখছিল। জয়দেবদা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

"আরে, বাত বোল! কী দেখছিস রে তুই?"

"দেখছি। ওরা এখানে কী করছে।"

"কুছ না। রশি টানছে, দাগি মারছে।"

"কেন?"

"কাহে রে? দাগি মারতে মানা আছে?"

"এটা সরকারি জমি।"

"তো উসমে কী আছে! মিট্টি নিয়ে ওরা ভেগে যাবে?"

"দাগ মারবে কেন?"

"আচ্ছা! কাহে মারবে!... আরে বুলুয়া তুই 'বয়েল' জানিস?"

"ষাঁড়!"

"হাঁ হাঁ, ষাঁড়। বয়েল দৌড় দেখেছিস?"

"মানে?"

"বয়েল গাড়ি রেস্ দেবে। দেখেছিস তুই?"

"না।"

416
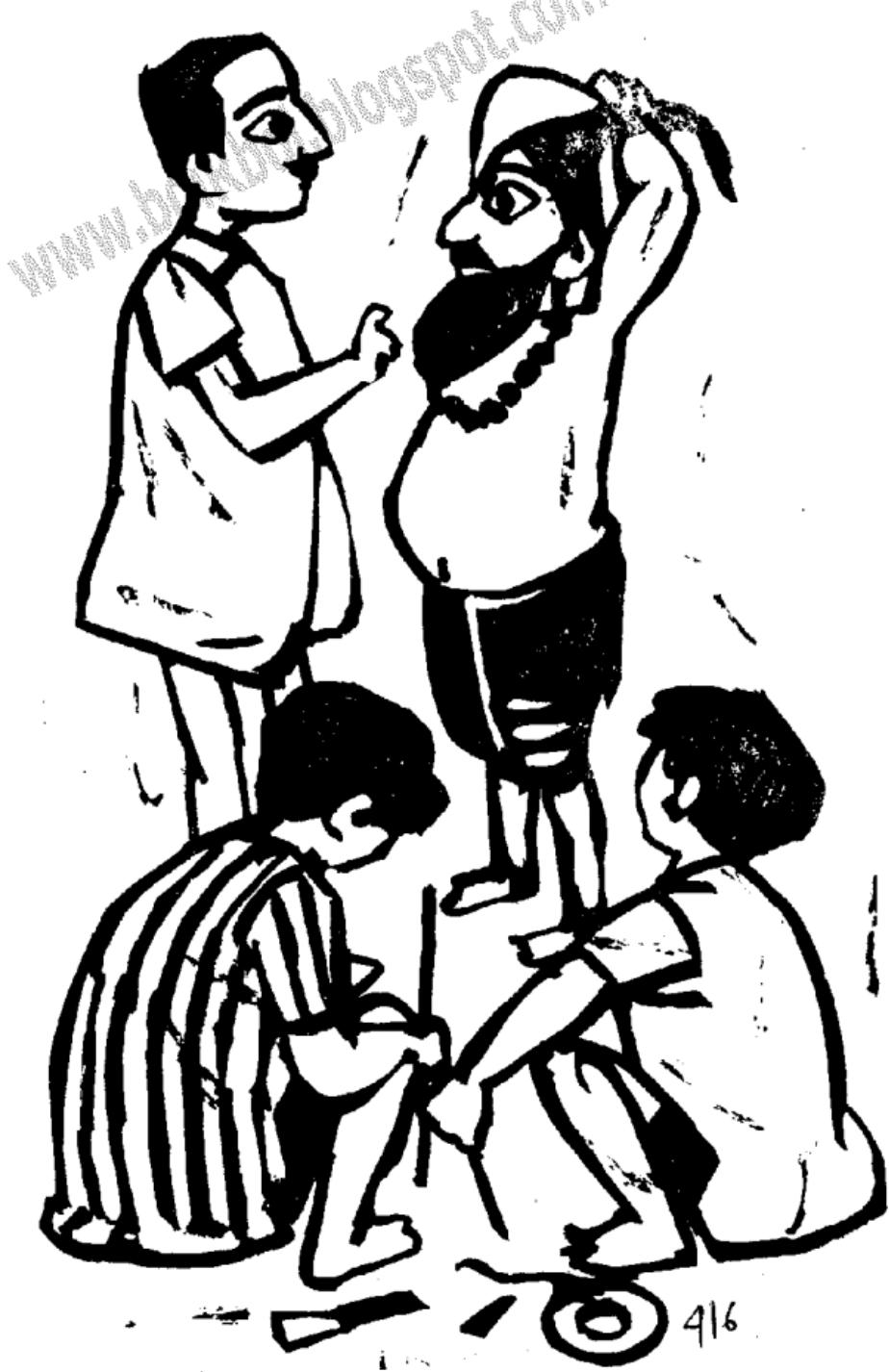
"তো দেখছি। মেলা যো দিন শেষ হবে উস্ দিন এখানে আমি ষাঁড় আর গোরুর গাড়ির রেস্ লাগাব। আরে বেটা, তুই গাঁ-দেহাত জানিস না। দেহাতে ভারী ভারী মেলায় বয়েল গাড়ি রেস্ মারে। গাইয়া গাড়িও। বহুত মজা। গাড়িমে পতাকা বাঁধে লাল-নীল, বয়েলের শিং-মে কাপড়া লাগায় লাল। বাদ মে রেস হয়।"

"এখানে হয় না।"

"ইসবার হবে।...আমি লাগিয়ে দেব।"

"কেন?"

"মজা হবে। পয়লা গাড়ি বিশ টাকা পাবে। দোসরা পনারা। তিসরা দশ।"

"কে দেবে টাকা?"

"স-ব দেবে। মেলার দোকানিরা দেবে। আমি ভি দেব।"

বুলুয়া কী ভাবল, জয়দেবদাকে নিচু গলায় কী যেন বলল বিড়বিড় করে। জয়দেবদা মাথা নাড়ল। বলল, গোরুর গাড়ির দৌড় সে দুমকার গাঁয়ে দেখেছে। লোকে খুব হইচই করে।

"ঠিক আছে। দেখব।" বুলুদা পিছু হটতে বাধ্য হল।

মহেশজি বললেন, "আরে বুলুয়া, তুই তো সব জানিস। আচ্ছা, এক বাত বোল। বলরামজি আর কিষাণজি—একবার..."

"কে বলরামজি?"

"রাম রাম, তুই বলরামজি জানিস না। কিষাণজির দাদা—"

"ও, বলরাম আর কৃষ্ণ!"

"হাঁ। ঠিক।" বলে মহেশজি মাথা নাড়লেন। ততক্ষণে তাঁর ঝুঁটি-বাঁধা শেষ। বললেন, "দুই ভাই—বড় আর ছোট মিলে খেলা করতে করতে হঠাৎ দুটো ষাঁড়ের গাড়ি দেখতে পেয়ে মজা করে দৌড় লাগাবার খেলা খেলতে গেলেন। খেলতে গিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। একবার বলরাম আগে তো কৃষ্ণ

পেছনে, আবার কৃষ্ণ আগে তো বলরাম পেছনে। ছুটতে ছুটতে মাঠঘাট ডাঙা শেষ, সামনে সমুদ্র। তখন কৃষ্ণ বললেন, দাদা এবার কী হবে? বলরাম বললেন, পরোয়া নেই, ষাঁড়গুলোকে ঘোড়া বানিয়ে নে। আকাশ দিয়ে যাব।"

বুলুদা ঠাট্টা করে বলল, "ষাঁড়কে ঘোড়া বানালে ওড়া যায়?"

মহেশজি বললেন, "বুলুয়া, তুই পুরাণ-উরান জানিস বেটা। দেবতা লোক ঘোড়ার রথে করে কাঁহা কাঁহা ঘুমতো ফিরত।... সুরজ্‌দেবকা সাত ঘোড়া, জানিস না! তো আর এক বাত বোল। দৌড়মে কোন্ জিত গিয়া?"

বুলুদা বলল, "জানি না।"

মহেশজি বললেন, "কিষাণজি।" বলে হাসতে লাগলেন।

"কেমন করে?"

"বলরামজি থোড়া বোকা ছিলেন। কিষাণজি চালাকি করলেন।" বলে মহেশজি তুড়ি বাজালেন। "কিষাণজি ঘোড়া বানালেন না। বলরামজিকে বললেন, ঘোড়ামে কাম নেহি। তুমি যমুনা নদীকে নাগিচ এনেছিলে মনে আছে!"

আমরা জীবনেও শুনিনি নদীকে কাছে আনা যায়। বুলুদাও শোনেনি।

মহেশজি গল্পটা শুনিয়ে দিলেন। "বলরাম একবার যমুনা নদীতে স্নান করতে গিয়েছেন। নদী খানিকটা দূরে। বলরামকে দেখে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। বলরামের রাগ চড়ে গেল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের গামছা ফেলে, হাতের লাঙলটা নদীর দিকে ছুড়ে দিয়ে মারলেন টান। লাঙলের ফলার টানে নদী কাছে এসে গেল।"

আমরা হেসে উঠলাম।

মহেশজি বললেন, "হাসিস না, পুরাণে দেখে নিস। তা কৃষ্ণ চালাকি করে দাদাকে মনে করিয়ে দিলেন, বলরাম যদি সমুদ্রে না

গিয়ে ডাঙাতেই লাঙলটা গেঁথে দেন—তা হলে ডাঙাই লাঙলের ফলার টানে এগুতে থাকবে।"

বলরামজি ছোট ভাইয়ের কথামতন লাঙলটা ছুড়ে দিলেন।

"বাদ কী হল জানিস?" মহেশজি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

"কী?"

"বলরামজির গাড়ি আটকে গেল। কিষাণজি থোড়া দূরে গিয়ে থেমে গেলেন।"

"তো?"

"জিত হয়ে গেল কিষাণজির।" মহেশজি জোরে হেসে উঠলেন।

বুলুদা রেগে গরগর করতে করতে জয়দেবদাকে বলল, "ধান্দাবাজি। দেখি ওর গোরুর গাড়ির দৌড় কেমন হয়! দু-একদিনের মধ্যে খেলা শেষ হবে তোমার।" চলে গেল বুলুদারা।

আমরা আবার মেতে উঠলাম কাজে।

মন্দির থেকে, ঠিক যেখানে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মহেশজি, সেখান থেকে একেবারে সিধে নাক বরাবর সোজা দাগ মেরেছিলাম আমরা ইমলি তালাও পর্যন্ত। তিন নম্বর পাথরটা যেখানে আছে—ঠিক ততটা। অনেকটা লম্বা দাগ দিতে হয়েছে বলে পুরো দৈর্ঘ্যটা ভাগ করেছি সমান দশ ভাগে। প্রত্যেকটি ভাগের শেষে দাগ। এইভাবে একেবারে চুলচেরা হিসেব করে মাঝ-জায়গা স্থির করে নিয়েছি। তার চারপাশে বড় একটা চৌকো দাগি মেরেছি। লোটা দাগ ধরে ধরে কোদাল দিয়ে মাটি বুলিয়ে আরও স্পষ্ট করেছে লাইনটা।

মহেশজির পছন্দ হয়েছে আমাদের কাজ।

কিন্তু এর পর?

মেলা শেষ হওয়ার দিন মহেশজি রটিয়ে দিলেন, কাল এখানে

বয়েল আর গোরুর গাড়ির দৌড় হবে। যে পয়লা নম্বর হয়ে জিতবে, সে পাবে কুড়ি টাকা। দুসরা হলে পনারা টাকা। তিসরা দশ।... তখনকার দিনে কুড়ি টাকা কম নয়। কুড়ি টাকায় ভরিখানেক সোনা কেনা যেত।

আমাদের মাঘাইয়া মেলায় এমন জিনিস আর হয়নি আগে।

লোকের মুখে মুখে কথাটা রটে গেল। সারা শহর জুড়ে রীতিমত এক উত্তেজনা। সত্যি তো, এতকাল কত কিছু আসছে মেলায়। এমনকী হাতি, ক্লাউন, বাঁশিঅলা, এক হরবোলা পর্যন্ত। কিন্তু ষাঁড় গোরুর গাড়ির দৌড় আগে কখনও হয়নি।

যাদের গোরুর গাড়ি আছে তারা নাচতে লাগল। বেজায় তোয়াজ চলল ষাঁড় গোরুর।

এদিকে মেলা শেষ।

শেষের দিনে কী ভীষণ ভিড়! ধুলোয় ধুলোয় আকাশও যেন হলদেটে হয়ে গিয়েছে। ওরই মধ্যে ঢোলক বাজাচ্ছে একটা লোক। ঝমঝম করে করতাল বাজাচ্ছে আর একজন।

সন্ধে হয়েও যেন হয় না। কার্বাইডের আলো, মাঝেমধ্যে হ্যাজাক, ওরই মধ্যে তফাতে এক-আধ ঝাঁক জোনাকির নাচন।

পরের দিন সেই দৌড়।

দুপুরে।

কাতারে কাতারে লোক।

মহেশজি দৌড় শুরু করিয়ে দিলেন। সে কী চিৎকার, লাফালাফি, গোরুগুলো ভড়কে গিয়ে বেদিকে ছুটে যায়। আবার ধরে আনতে হয়।

লোকের হল্লা। আমরাও লাফাচ্ছি।

দৌড় যখন শেষ তখন একটা আওয়াজ কানে গেল।

তাকাল সবাই।

একটা মোটরগাড়ি। সেকালের সেই মোটরগাড়ি এখন দেখা যায় না। কল্পনা করাও মুশকিল। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া, আর তার কী চেহারা! বিশালই বলা যায়। গর্জনও সেইরকম।

আমাদের শহরে সাকুল্যে তিনটে মোটরগাড়ি ছিল। দুটো গাড়ি সাহেবপাড়ার। আরেকটা ভাঙাচোরা অবস্থায় মানিক ডাক্তারের বাড়ির গুদোমে পড়ে থাকত।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

গাড়ি থামল।

জনাচারেক লোক নেমে এল। আর দু'জন কনস্টেবল। লোকগুলো কেউ সাহেব নয়। তবে পোশাকে সাহেব। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট। গায়ে শার্ট। কোট। একজনের হাতে ছোট দড়ি। মোটা দেখতে। সব ক'জনেরই দেখি চওড়া গোঁফ।

মহেশজি তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কী কথা হল কে জানে, দড়িঅলা লোকটা দেখি মহেশজির পিঠ চাপড়াচ্ছেন।

পরের দিন রবিবার।

বেলা বেশি হয়নি। ইন্দু ছুটতে ছুটতে আমার বাড়িতে এসে বলল, "কী হয়েছে জানিস?"

"কী?"

"সদর থেকে হাকিমসাহেবরা এসেছেন। ওই যে কাল দেখলাম,

মোটরগাড়ি—মেলায় এসে থামল—!"

"কে বলল তোকে?"

"বুলুদা। বুলুদা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, আর আ গিয়া হাকিম! আমাকে বলল, যা এবার গিয়ে দ্যাখ। হাকিমসাহেবরা দলবল নিয়ে চলে এসেছেন। কাল রাত্তিরে ডাকবাংলোয় ছিলেন। আজ তোদের গুরুজিকে হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি, পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবেন। মহেশজির আখড়া ভেঙে চৌপাট করে দেবে সেপাইরা।"

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। সর্বনাশ! মহেশজির হাতে হাতকড়া পড়বে! কিন্তু কাল সাহেবরা আসার পর তো তা মনে হয়নি।

"কী করবি?" আমি বললাম।

ইন্দু বলল, "আমরা সবাই যাব। দেখব কী হয়? বুলুদার কথা শুনে আগে থেকে ঘাবড়ে গেলে চলবে না!"

"কখন যাবি?"

"দুপুরে চল। সবাই একসঙ্গে যাব।"

দুপুরে মেলার মাঠে হাজির হয়ে দেখি, খবরটা রটে গিয়েছে শহরময়। অনেক লোক জমে গিয়েছে মাঠে। এমনিতে মেলা ফুরিয়ে গেলেও সব দোকানি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে পারেনি। কিছু দোকানি তখনও ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছিল। বাঁশ, খুঁটি, ছেঁড়া তেরপলের টুকরো তখনও পড়ে আছে কোথাও কোথাও। ওরা তো ছিলই, তার ওপর শহরের লোক জমেছে মজা দেখতে। আমাদের মধুগঞ্জ শহরে এরকম ঘটনা আগে আর ঘটেনি।

আমরা মহেশজিকে কী দেখব, তার আগেই দেখলাম, পাঁচ-সাতটা সেপাই—আমাদের কোতোয়ালির, লাইন করে দাঁড়িয়ে ভিড় সরিয়ে দিচ্ছে।

মহেশজির আখড়ার মাটির বারান্দায় একটা টুল। হাফপ্যান্ট পরা হাকিমসাহেব তার ওপর বসে। তাঁর প্রায় কাছেই অন্য এক সাহেব। আমাদের এদিককার কেউ হবেন। আর মধুগঞ্জ শহরের দারোগাজি সেলাম ঠোকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

ওদিকে—আমরা যে দাগ মেরেছিলাম চুনের—মন্দির থেকে তালাও পর্যন্ত, তার নতুন করে মাপজোক হয়ে যাওয়ার পর একটা লোক কেমন এক তেঠ্যাঙা কাঠের ফ্রেম নিয়ে লম্বা একটা যন্ত্র বসিয়ে সব দেখে নিচ্ছে।

আমরা আমাদের হিসেবমতন—মন্দির থেকে তালাও পর্যন্ত লম্বা দাগটার মাঝামাঝি জায়গা ঠিক করে চুনের চৌকো চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম। দেখলাম, সেই চৌকো জায়গাটা আরও বড় করে নিয়ে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। কোদাল, গাঁইতি, শাবল, কী নেই! লোকটা আর হাত লাগাচ্ছে না। হাকিমসাহেবের হুকুমমতন আনা মজুররা মাটি খুঁড়ছে। পাশেই এক বেঁটেমতন সাহেববাবু, তাঁর পাশে মহেশজি।

বুলুদারাও দেখি কখন চলে এসেছে। তারাও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হল আমাদের সঙ্গে। আমরা যেন ঠাট্টা করে ইশারায় বোঝালাম, 'কোথায় বুলুদা, আমাদের মহেশজির হাতে হাতকড়া কোথায়, দড়ি কোথায় কোমরে!'

বুলুদা আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় মহেশজি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আগেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

উনি কাছে এলে আমরা বললাম, "আপনার বারান্দায় যিনি বসে আছেন উনি হাকিমসাহেব?"

"হ্যাঁ। আর পাশে যিনি আছেন উনি পটনার সার্ভে অফিসের সাহেব। পটনা থেকে এসেছেন।"

মহেশজি একেবারে স্পষ্ট বাংলায় বললেন এবার।

"ওঁরা আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে এসেছেন?"

"হ্যাত, বোকা। আমার আবার ঝামেলা কী?"

"ওরা মাটি খুঁড়ছে কেন?"

"দো নম্বর পাথর। পুরো জায়গা মাটি তুলে পাঁচ-সাত হাত তলায় দেখতে হবে।"

"কী পাওয়া যাবে, মহেশজি?"

"দ্যাখ কী পাওয়া যায়। তোরা ভেঙে পড়িস না, থেকে যা; আমি হাকিমসাহেবের সঙ্গে জরুরি কাজ সেরে নিই।"

চলে গেলেন মহেশজি। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ভিড় বেড়েই যাচ্ছে। সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়। পুলিশ তাদের হটিয়ে দিচ্ছে।

ইমলি তালাও থেকে বাতাস ভেসে আসছিল। পড়ন্ত শীতের শিরশিরে হাওয়া। রোদও চমৎকার গরম। শীত করছিল না আমাদের।

মাটি খোঁড়ার শেষ নেই। একদল খুঁড়ছে, অন্যদল পরিষ্কার করে দিচ্ছে জায়গাটা।

বুলুদা এবার আড়ালে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মহেশজি সাহেবদের সঙ্গে কথা বলছেন, মাথা নাড়ছেন, সাহেবরাও কী জিজ্ঞেস করছেন। একজনের হাতে একটা মোটা ডায়েরি খাতার মতন বই। বারবার কী যে দেখছিলেন!

হঠাৎ একটা কলরব।

যারা মাটি খুঁড়ছিল তারা চিৎকার করে উঠল।

মহেশজি ছুটে গেলেন ওদিকে।

তারপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখলেন মাটির তলায়। আনন্দে, উত্তেজনায় তিনি দিশেহারা।

দু' নম্বর পাথরটা পাওয়া গিয়েছে।

হাকিমসাহেবরাও এগিয়ে এসেছেন ততক্ষণে।

"পাথর হাটা লে—! উঠা লে..." কে যেন বলল। মহেশজিই বোধ হয়, ভিড়ের একটা চক্কর হয়ে গিয়েছে জায়গাটার চারপাশে।

পাথর সরানো হল।

তারপর যা চোখে পড়ল, আমরা আর দেখতে পেলাম না।

হইহই, লাফালাফির পর মাটির তলা থেকে একটা কলসি—মুখটা বড়, তুলে নিয়ে মহেশজির ঘরের দাওয়ার কাছে রাখা হল।

কলসিটার মুখে ঢাকনা ছিল। মাটির রঙে একেবারে মেটে হয়ে গিয়েছে কলসির গা। অথচ বোঝা যাচ্ছিল—ওটা কোনও ধাতুর। হয়তো কাঁসারই। তামারও হতে পারে। আমরা কেমন করে বুঝব!

মহেশজি নিজেই কলসির মুখের ঢাকনা খুললেন। সাবধানে।

হাকিমসাহেব কিছু বললেন।

মাথা নাড়লেন মহেশজি, তারপর হাত ডুবিয়ে দিলেন কলসির মধ্যে।

আমরাও তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছি।

কলসির মধ্যে তিন-চারটে জিনিস পাওয়া গেল। একটা ছোরা। সোনার পাত-বসানো পাতের ওপর পাথরের কাজ-করা। খাপের মধ্যে ছোরাটা ছিল। ছোরার হাতলটা সত্যি দেখার মতন। হাড় দিয়ে বাঁধানো। ছোরার ফলাও ঝকঝক করছিল—তবে ততটা নয়। পাওয়া গেল একটা মুক্তোর মালা। ছোট। আর সোনার একটা গোল পাতি—মানে কপালে বাঁধার। তাতে কয়েকটা দামি পাথর সেট্ করা। আর পাওয়া গেল কালো কষ্টিপাথরের ছোট একটা শিবমূর্তি।

ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে কে যেন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "জয় শিবশম্ভু!"

অন্যরাও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

হাকিমসাহেব জিনিসগুলো দেখছিলেন অবাক হয়ে, সার্ভেয়ার সাহেব মুগ্ধ।

মহেশজির সারা মুখে তৃপ্তির হাসি।

আমাদের দিকে নজর পড়তে কাছে ডেকে বললেন, "এই জিনিসগুলো সব রাজা সুরথদেবের। তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। কম করেও সোয়াশ' দেড়শো বছরের পুরনো।"

অন্তু বলল, "ছোরাটা রাজা সুরথদেবের?"

"হাঁ। ছোরা রাজার। মালা রাজার গলার মালা।"

"আর ওই সোনার পাতি?"

"রাজার। ওটাও রাজ-চিহ্ন। কপালে জড়ানো থাকত।"

"রাজার কী হল?"

"রাজা আর যুদ্ধজয় করতে পারেননি। ভেবেছিলেন, সুযোগ পেলে ফিরে গিয়ে লড়বেন শত্রুর সঙ্গে। সে সুযোগ পাননি।"

"তিনি হেরে গিয়েছিলেন?"

"হাঁ। তবে তাঁর রাজ-চিহ্নগুলো যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে সেজন্যে শুধু এই দুটো জিনিস লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এগুলো এখন সরকারি সম্পত্তি। মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হবে।"

"সুরথদেবের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

মহেশজি হাসলেন। "তোরা বুঝবি না। রাজার কথা এদিককার ইতিহাসে কম-বেশি আছে। আছে এই তালাওয়ের কথা।" বলেই নিচু গলায় বললেন, "তোদের রামেশ্বরজি কুছ কুছ জানে। চালাক আদমি।... আরে, বুলুদা কোথায়?"

বুলুদাকে আর দেখা গেল না। পালিয়ে গিয়েছে লজ্জায়।

হঠাৎ মহেশজি আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন সোজা হাকিমসাহেবের কাছে। বললেন, "সার, এই বাচ্চা ছেলেগুলো আমায় অনেক সাহায্য করেছে। এরা বড় ভাল।"

হাকিমসাহেব হাসলেন। তারপর আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক্ করলেন। পিঠ চাপড়ে দিলেন।

ফেরার সময় বিরজু হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর ফুলদানি ক্লাব। হিপ হিপ হুররে...।"

আমরাও হিপ হিপ হুররে করতে করতে বাড়ি ফিরে এলাম।

অন্তু বলল, "হ্যাঁ রে, মহেশজিকে তো জিজ্ঞেস করা হল না, সত্যিই তিনি সাধু, না সরকারি লোক?"

ইন্দু বলল, "ধ্যুত, সাধু হলে এভাবে বসে থাকেন! সরকারি লোক, ছদ্মবেশে এসে বসে ছিলেন এখানে।"

আমাদেরও মনে হল, ইন্দু ঠিক কথাই বলেছে।